182. Mc. 922. 14.

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

রাজবুদ্ধির অর্জ্জন দাসবুদ্ধির বর্জ্জন

বঙ্কিম সমালোচনা

যেপড়িবেসেইকরিবে

ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ

কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিধবা-বিবাহ।

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি ;
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিষের বাতি।
তবে যদ্রি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন দিয়ে ;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি হয়ে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে
ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

মূল্য ছয় আনা

182. Mc. 922. 14.

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

487
200.23

রাজবুদ্ধির অর্জ্জন দাসবুদ্ধির বর্জ্জন

বঙ্কিম সমালোচনা

যেপড়িবেসেইকরিবে

ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ

কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিধবা-বিবাহ।

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি ;
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিষের বাতি।
তবে যদ্রি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন দিয়ে ;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি হয়ে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

মূল্য ছয় আনা

IMPERIAL LIBRARY 19

FEMALE FRIEND

(ফিমেল ফ্রেণ্ড।)

এই অমোঘ উপকারী মহৌষধির সেবনে ঋতুদোষ, বাধক শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রমণীরোগ সকল সমূলে নির্ম্মূলিত হয়। প্রসবের পর এই ঔষধ সেবন করিলে সেই জননীতে সূতিকাসম্ভব কোন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে না। প্রসবের পূর্ব্বে জরায়ু বা পো-নাড়ীর মুখ খুলিয়া যাইবার পর এই ঔষধ উচ্চ মাত্রায় পান করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসব করিবে। প্রথমবারের প্রসূতিকে এ ঔষধে প্রসব না করানই উচিত। তবে ভাল ধাত্রীর হাতে হইলে ক্ষতি হইবে না। এই ঔষধ গৃহে গৃহে সঞ্চিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিরারোগ্য অর্থাৎ বহুকালের পুরাতন রোগ সকলের বিবরণ সহ ৫৲ টাকা ফিস পাঠাইলে ডাঃ হোসেন সাহেব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঔষধ ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধের মূল্যও বেশী ক্রিয়াও বেশী।

হাসেম কাসেম এণ্ড কোং
৬৩ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দরবার প্রেস

দরবার প্রেসে সকল প্রকার জবের কাজ অতি সুন্দর রূপে ও সুলভ মূল্যে ছাপা হইয়া থাকে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন। বাঙ্গালা ইংরাজী ও উর্দ্দু সকল প্রকার টাইপ প্রচুর পরিমানে মজুত আছে।

S. A. HASHEM, B. A.

182. Mc. 922. 14.

ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ

---

১ * নেদম্ ইক্ষুদণ্ডম্ বিষবৃক্ষ। * ১

BENGAL LIBRARY
Date 12 APL 1922

যখন সা[illegible]ক কোন দোষ বা কুপ্রথার প্রচলন হইয়া, সাম্প্রদায়িক ক্ষতি [illegible]থাকে, তখনি এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, সেই পতিতসমাজ ও সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রতিবিধানে দণ্ডায়মান হইতে দেখি।

ভারতের প্রাচীন-ইতিহাস পাঠ করিয়া, বর্ত্তমান ভারতবাসীর দিকে লক্ষ্য করিলে, ইহাদের লোক সংখ্যা, মানসিক শক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা ও দেহ প্রভৃতির যে কি পরিমাণ অধঃপতন হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এবং এই সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি এইরূপ ধারাবাহী অত্যাচার হইতে থাকিলে, ইহা যে ক[illegible] এককালে বিলুপ্ত হইবে, তাহা দূরদর্শীদিগের নয়নের অগোচর নহে। ভ্রান্তবুদ্ধির-ব[illegible]ড়িয়া এই ভারত যে কি ভাবে দিন দিন বিলীন, মৃতবৎ ও মরুভূমি হইয়া আসিতেছে তাহাও, তাঁহাদের নেত্রতলে জাজ্জ্বল্যমান।

সেই অতীত সময় হইতে এ সময় পর্য্যন্ত এই বিশ্বব্যাপী জাতি, স্বীয় জাতি, ধর্ম্ম ও লোক সংখ্যার প্রতি এত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াও, এখন যে এ জাতি বাঁচিয়া আছে, সে কেবলমাত্র ঈশ্বরের অপার কৃপায়। এ দেশের উপর ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কৃপা বর্ষিত হইতেছে, তাহা জ্ঞানীমাত্রই স্বীকার করেন। পৃথিবীর নানাস্থল ভ্রমণ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেখা যায়, এ দেশের মত ষড়ঋতুর আবির্ভাব অন্যত্র নাই। পৃথিবীর এমন আবর্ত্তন, এমন বীর্য্যবর্ষী সূর্য্যোত্তাপ, আয়ুবর্দ্ধী বায়ু, শস্য-হিতৈষী বর্ষা, কল্যাণকামী শীত, আনন্দময় বসন্ত, বিমলকলেবরা শরৎ এবং এইরূপ শত শত মনস্তুষ্টিকর ঈশ্বরকৃপা অন্যান্যদেশে নাই। যেন আকাশ ও ধরা জায়াপতি সম্পর্কে পরিবদ্ধ হইয়া একযোগে ও একমন ধ্যানে, এই ভারত-পত্নীর

পুত্রকন্যাদের যাবতীয় অভাব মোচন করিতেছে। আকাশের এই আশ্চর্য্য দয়া ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশে অতি অল্প। এই শস্য-শ্যামলা আকাশপত্নী ভারতমাতার গর্ভে ভারতবাসীর জন্ম। কাজেই এ জাতির কখনই অভাব হইতে পারে না। তবে হইতেছে কেন?—ধনীজননীর সন্তানেরাই অলস, আব্দারে, উদ্‌ভ্রান্ত ও কাণ্ডজ্ঞান-হীন হইয়া থাকে। ইহারাও কার্য্যদোষে, ধর্ম্মের অভাবে, ধনের অহঙ্কারে চিত্তের মধ্যে মন্দবৃত্তির স্থান দিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।

ভারতবাসীর এই সকল অসদাচরণের দিকে লক্ষ্য করিয়া, সুদূরদর্শী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, এক মহা চিন্তায় চিন্তান্বিত হইলেন। অনেক চিন্তার পর পরিশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 'বিধবাদিগকে 'বিধবা' করিয়া রাখিয়া এই জাতিও বিধবাবৎ অন্তর্দাহে বিদগ্ধ, সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত, লম্পট-লীলায় উন্মত্ত, ভ্রূণ-হত্যায় নির্ভয়চিত্ত ও শাখা-প্রশাখায় বিবর্জ্জিতহইয়াদিন দিন বিলীন হইয়া আসিতেছে। অবনতির-বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে; ধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞান-গুণ প্রভৃতি আর [illegible] ও পৈত্রিক ধন-সম্পত্তি সকল ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেছে। সমাজ বিধবাদিগের প্রতি যে পরিমাণ কঠোর অত্যাচার প্রচার করিয়াছে, বিধাতা এ জাতির প্রতি তাহার সহস্রগুণ অত্যাচার করিতে দাঁড়াইয়াছেন।'

'বিধবাদিগকে লইয়া আমরা অনেক সময়ে কলঙ্ককর-লজ্জাবহ-দ্বন্দ্বে পরিলিপ্ত হইতেছি, পূতিগন্ধ কর্দ্দমে নিপতিত হইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্টের-পাত্র সাজিতেছি। আবার অনেক সময়ে সমাজকে ধূলিলোচন করিয়া আমাদের মান-সম্ভ্রম ও [illegible] রক্ষা করিতেছি এবং পাপ করিয়া পাপ ঢাকিতেছি। আবার এ [illegible] সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, আমরাই ঐ নিরীহ বিধবাদিগকে ঐ সকল পাপে পরিলিপ্তা করাইয়া রাখিয়াছি। আমরাই উহাদের উর্ব্বর জঠর-জমিকে নির্বীজ করিয়া সাম্প্রদায়িক লোকবল হ্রাস করিতেছি; তাই আজ, এই সীমাহীন-সমুদ্রবৎ সম্প্রদায়, গণ্ডিগত গণ্ডূষে পরিণত হইয়াছে।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিন্তাস্রোত মুখ ফিরাইল। তিনি চিন্তার নয়নে, বঙ্গের ন্যায় দীর্ঘাকার, অন্য এক অভিনব দেশ দর্শন করিলেন, এবং একে একে ঐরূপ আরও কতিপয় দেশের দর্শন পাইলেন। সে সমুদায় দেশই অগম্য সমুদ্রমধ্যে জনশূন্য দ্বীপ। তিনি সেই দ্বীপগুলিকে জনাকীর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সে সময়ে ভারতবর্ষে ১৩৬০০০ বিধবা ছিল, তন্মধ্যে প্রায় একলক্ষ যুবতী। তিনি সেই বীর্য্যবতী যুবতীদিগকে লইয়া তাঁহার সেই কল্পরাজ্যের প্রথম

রাজ্যে স্থানদান করিলেন, এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে বীর্য্যবান পুরুষ ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর ভারতবর্ষে যত যুবতীকন্যা বিধবা হইতে লাগিল, তিনি তাঁহাদিগকে তদীয় দ্বিতীয় কল্পরাজ্যে প্রেরণ করিতে লাগিলেন! ২৫ বৎসর পর তিনি উক্ত দ্বীপদ্বয়ের পর্য্যালোচনায় গমন করিয়া দেখিলেন, প্রথম দ্বীপের লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ এবং দ্বিতীয় দ্বীপের ৪ লক্ষ হইয়াছে। ইহার পর তিনি ভারতীয় বিধবাদিগকে তৃতীয় দ্বীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আবার ২৫ বৎসর পর তিনি দ্বিতীয়বার দ্বীপদর্শনে গমন করিলেন, দেখিলেন—প্রথম দ্বীপে ৪০ লক্ষ, দ্বিতীয়তে ২০ লক্ষ, এবং তৃতীয়তে ৪ লক্ষ লোকসংখ্যা হইয়াছে। তিনি এবার হইতে বিধবাদিগকে চতুর্থ দ্বীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং ২৫ বৎসর পর পুনরায় দ্বীপদর্শনে গমন করিয়া দেখিলেন,—প্রথম দ্বীপে ২ কোটী, দ্বিতীয়তে ১ কোটী, তৃতীয়তে ২০ লক্ষ, এবং চতুর্থতে ৪ লক্ষ লোক বিরাজ করিতেছে। এবার তিনি ভারতীয় বিধবাদিগকে পঞ্চম দ্বীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তারপর ২৫ বৎসর কাল অতীত করিয়া, তিনি চতুর্থবার অর্থাৎ শতবার্ষিক দেশভ্রমণে গমন করিলেন, দেখিলেন।—প্রথমদ্বীপে ১০ কোটী, দ্বিতীয়তে ২ কোটী, তৃতীয়তে ১ কোটী, চতুর্থতে ২০ লক্ষ, এবং পঞ্চমে ৪ লক্ষ লোক, নগর-পল্লী কান্তার-বন উজ্জ্বল করিয়া বাস করিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় সুচারু চিন্তার আশ্রয় লইয়া, ভারতের পরিত্যক্ত বিধবাদিগকে লইয়া বঙ্গদেশের মত পাঁচটা বৃহৎ রাজ্য আবাদ করিয়া লইয়া, আবার চিন্তা করিলেন।—'বিধবাদিগের বিবাহ না দিয়া আমরা কি সাধারণ অনিষ্ট করিতেছি। প্রতি একশত বৎসরে আমাদের, সংখ্যায় ১৪ কোটী লোক বাড়িত! এই কল্পনাশূন্য জাতি, হিতাহিত বুঝিতে পারে না বলিয়া, শীঘ্রই ধরা হইতে মুছিয়া যাইবে। অদ্য হইতে ২০ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুরা মোস্‌লেম সংখ্যার নিম্নে পড়িবে। এই নির্ব্বোধ পতিতজাতিকে যতই উপদেশ দেওয়া হউক না কেন, সদুপদেশ ইহাদের কর্ণে বিষবৎ অনুভূত হয়। কে বুঝিতে পারে যে, প্রতি একশত বৎসরে আমরা ১৪ কোটী করিয়া নর-নারী হত্যা করিতেছি। উহাদিগকে উহাদের মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট করিতেছি,জগতের মহিমা দর্শন করিতে ও আমাদের জনবল বাড়াইতে দিতেছি না। ইহা হইতে পাশবিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে? আমরা প্রতিহিংসায় এবং বৎসহন্তায় সর্প-স্বরূপ খলজাতি নহি কি? যখন আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছি, যখন সৃষ্টি ধ্বংশকরাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া

লইয়াছি, তখন তিনিও এ জাতিকে ধরা হইতে মুছিয়া না দিবেন কেন?—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনী ও নভেলগত প্রাণ হইবার কারণে, আমরা জাতি ও দেশগত কথা, আদৌ বুঝিতে পারি না। ইহাকেই গোলামবুদ্ধি বলে। নভেল সকল এই গোলাম বুদ্ধিতে শাণ ধরায়, তাই নভেলই আমাদের প্রিয়পাঠ্য ও আস্ত-সর্বস্ব-জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ২০।৩০ বৎসরের মধ্যেই এই নভেল সকলের ভয়ানক তিক্ত ফল দেশের সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইয়া যাইবে। তখন এই বঙ্গদেশটি এক বিরাট্ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইবে। দেশবাসীরা সেই মঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রী সাজিয়া এমন উন্মত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইবে যে, তখন যদি কেহ ইহাদিগকে রাজবুদ্ধির বা দেশহিতৈষণার দিকে আহ্বান করেন, ইহারা ভাবিবে, ইহাদিগকে অভিনয় করিতে ডাকা হইতেছে। ইহারা যাইয়াও অবিকল আনন্দমঠের অভিনয় খুলিয়া বসিবে। সকলেই ‘হা অন্ন, হা অন্ন’ করিবে কিন্তু কেহই বুঝিবে না, যে ‘সমুদ্র শুকাইলে সরোবরেও জল থাকে না।’

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এবম্প্রকার চিন্তা করিবার পর ‘বিধবা-বিবাহ’ নামক এক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তাহা দেশের সর্ব্বত্র দেখাইয়া তৎকালীন ভারতীয় শাস্ত্রীয়দিগকে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন। এই উপলক্ষে সে সময়ে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায়, দুর্ব্বল সমাজের পক্ষ হইতে, একমাত্র রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতায়, এই বিধবা-বিবাহের প্রচলন হইল না। এই বিধবা-বিবাহ নামক ইক্ষু বৃক্ষের বিপক্ষতা করিয়া এবং তাঁহাকে ‘নেদম্ ইক্ষুদণ্ডম্—বিষবৃক্ষ’ স্থির করিয়া, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... এই ‘বিষবৃক্ষ’ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, তদীয় পতিত-বুদ্ধি পাঠকদিগের গোলামজ্ঞানে শাণ ধরাইয়া দিয়া, রাজজ্ঞানকে চিরকালের জন্য ভোঁতা করিয়া দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় রাজবুদ্ধি মতে এবং ভূত ও ভবিষ্যদর্শী নয়নের সাহায্য লইয়া বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অদূরদর্শী দাসবুদ্ধি ব্যক্তিরা সেই মহাভাবুকের ভাবসমূহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, তাঁহার সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। এই শেষ শ্রেণীর লোকেরাই বঙ্কিমবাবুর উপাসক হইবার কারণে, তিনি নিজে বিধবা-বিবাহের উপকারিতা সকল বুঝিতে পারিলেও, ভক্তদিগের মনোরঞ্জনার্থ এই বিষবৃক্ষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন!—এইরূপ অনুরোধে পড়িয়া অনেক জ্ঞানী লোকও, আদালতে দাঁড়াইয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া, অনুগত ব্যক্তিদের নিকট ধন্য হইয়া থাকেন। এস্থলে বঙ্কিমবাবুও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তদীয় জবানবন্দী বা এজাহাররূপ

বিষবৃক্ষ লিখিয়া সেইরূপেই ধন্য হইলেন। এইরূপ অলীক এজহার দিবার পর, তাঁহার বিবেকরূপ-জেরার-উকিল, তাঁহাকে বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন তিনি সেই জেরার স্থলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামক গ্রন্থ লিখিলেন এবং বিধবাদের দ্বারা দেশের কতদুর অপকার হইতেছে তাহা তিনি চোখ চিরিয়া দেখাইয়া দিয়া,বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কেস সপ্রমাণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু নভেল পড়া বিদ্যাদিগ্‌গজেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন কি? বঙ্কিমবাবুর দূরবীক্ষণশক্তি যে কতদূর আকাশস্পর্শী ও পারাবারদর্শী ছিল, তাঁহার বচনবিন্যাস ও বাক্যলীলার স্রোত ফিরাইবার ক্ষমতা যে কিরূপ প্রবল ছিল, এবং সত্য কথা গোপন করিলেও তাহা প্রকাশ করিবার কিরূপ অপরূপ কৌশল জানিতেন, আমরা তাহা জানিয়াও দেশের বিদ্যাদিগ্‌গজদিগের অসৎ ব্যবহারের ভয়ে, যে ভাবে এই সমালোচনা করিয়াছি, ইহার সূক্ষ্মপাঠে আমাদের মনের সকল ভাবই প্রকাশ পাইয়া যাইবে। এই পতিতবুদ্ধি বিদ্যাদিগ্‌গজদিগের মন রাখিতে গিয়াই, নভেল ঠাকুর প্রতিহিংসাদি নানাবিধ অলীকের আশ্রয় লইয়া গ্রন্থসকলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। যদি তিনি সত্যের সাপেক্ষ হইতেন, তবে এই অধঃপতিতজাতি কখনই তাঁহার গ্রন্থ ক্রয় করিতেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মাথায় দখল জন্মিলে কল্পনায় শাণ আপনিই পড়িবে, কিন্তু তাহা না হইয়া এ জাতি প্রকৃত কাকাতুয়ায় পরিণত হইল,।—**কল্পনাশূন্য বীরবক্তা।**

* বিষবৃক্ষের অনুসন্ধান। * ২

হরিপুর জেলায়, দেবীপুর এবং গোবিন্দপুর নামে দুইখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামদ্বয়-মধ্যে দুইজন জমিদার বাস করেন। দেবেন্দ্রবাবুর বাস দেবীপুরে। তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ, এক কুৎসিতা ভার্য্যার স্বামী। (ঠাকুরের বিবেচনায়, যে নারীর রূপ নাই তার গুণও নাই, সে পেত্নী; এবং যাঁহার রূপ আছে তাঁহার গুণও আছে, তিনি দেবী।) কাজেই দেবেন্দ্রবাবুর কুৎসিতা পত্নীটি, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী না হইয়া গৃহপেত্নী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সরলতাশূন্য চির-গরলমুখী বামা, তিমিরাবৃত তুফানবৎ অবিরত দেবেন্দ্রের প্রশান্ত হৃদয়ের অনন্তোৎফুল্ল তরঙ্গরাশি ভঙ্গ করিয়া দেয়। শেখসাদী বলেন—'স্বর্গ এবং নরক গৃহলক্ষ্মীর জিম্মায় রক্ষিত' 'রমণী গুণবতী হইলে স্বামী ধরাধামে স্বর্গভোগ করে; আর রমণী যদি ঝটিকামুখী হয়, তবে স্বামীকে

ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত, সেই কারণে তিনি সুরাদেবীর শরণাগত হইলেন। সুরাদেবীর প্রসাদে তিনি ঝড়কে বৃষ্টি দেখাইয়া পরাজয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু অল্পদিনেই তিনি একজন মস্ত সুরাপীত হইয়া পড়িলেন। (এখানে প্রমাণ হইল যে, সুরা সেবন না করিলে দুষ্ট পত্নীর উপর প্রভুত্ব করা যায় না। এখানে পত্নীর দোষে দেবেন্দ্রবাবু সুরাপীত হইলেন অথবা দেবেন্দ্র সুরাপীত হইবার কারণে তাঁহার পত্নী ঝটিকামুখী হইয়াছিল, পাঠক তাহা রাজবুদ্ধিমতে বুঝিয়া লইবেন।)

গোবিন্দপুরে যে জমিদারবাবু বাস করেন, তাহার নাম নগেন্দ্রনাথ দত্ত। নভেল ঠাকুর তাঁহাকে সকল গুণে বিভূষিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি নাকি, যেমন ধনী তেমনই জ্ঞানী, যেমন পরোপকারী, তেমনই সদ্‌গুণধারী;—যেমন ধর্ম্মপরায়ণ বীর, তেমনি ইন্দ্রিয়-বিজয়ী ধীর, প্রকৃতির মহামনস্বী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সূর্য্যমুখী তাঁহাকে ছাপাইয়া গুণবতী ও লক্ষ্মী-সরস্বতী ছিলেন। তিনি নাকি রূপে-গুণে, রসিকতায়, আচার-ব্যবহারে, স্বামী ভক্তিতে, স্নেহ-মমতা, চাল-চলনে, জনসাধারণের নেত্রাঞ্জন স্বরূপা ও পরম প্রত্যুৎপন্নমতি নারীরত্ন ছিলেন।

শিবিকাদণ্ডস্কন্ধধারী বাহকবৃন্দের ন্যায়, আমাদের করারোহী লেখনী, ঝড়াকারে জড়-বড়ী ভাষায় বকিতে শিক্ষা পায় নাই; সেই কারণে আমরা ঐ নিরূপম যুগল দম্পতির রূপ ও গুণরাশির বর্ণনা অতি সংক্ষেপে শেষ করিলাম। পাঠক ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছারূপে, স্ব স্ব রুচী ও কল্পনামতে যত ইচ্ছা বাড়াইয়া লইতে পারেন—তাহাতে নভেল ঠাকুরের অমর্য্যাদা করা হইবে না, এবং তিনি তাহাতে কোনরূপ আপত্তিও করিবেন না।

নগেন্দ্রবাবুর ভগিনীর নাম কমলমণি, শিশু ভাগিনেয়ের নাম সতীশবাবু এবং ভগিনীপতির নাম শ্রীশচন্দ্র, তাঁহারা সকলে কলিকাতায় থাকেন। সূর্য্যমুখীর সহিত কমলমণির অত্যন্ত সদ্ভাব, অবিরত দুইজনে লেখালেখী চলে। তাঁহারা উভয়েই মিসিস টেম্পালের নিকট একত্র শিক্ষা পাইয়াছিলেন; (তাই তাহাদের প্রেমটাও টেম্পল-প্লাবী প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।)

নগেন্দ্রবাবু স্বকীয় নৌকায় আরোহণ করিয়া, কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় যাইতেছেন। (নভেলের নায়ক-নায়িকারা যখন যে দিকে যায়, লেখককে তাহাদের ছায়া হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হয়, আমাদের ঠাকুরও তাই নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গ লইলেন। পথিমধ্যে ঠাকুর নগেন্দ্রনাথকে জ্বালাতন করিয়া মারিলেন। নদীর

কিরূপে ঘাটে আসিয়া স্নানাদি করিতেছে; তাহাদের সমল বস্ত্রের অবস্থা কেমন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে করিতে, মাঝে মাঝে রমণীদিগের প্রতি কিভাবে কটাক্ষক্ষেপণ করিতেছেন, সে সমুদায়ের বিচার করিতে করিতে চলিলেন; ঠাকুর এ কাজে যেমন মজবুত, ইতিহাসের কথা বলিতে তেমনই ভীরু। ইতিহাস দেখিলে বলেন।—"সে সকল ঐতিহাসিক কথা, কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা, আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না।" ঠাকুরের লীলা ঠাকুরই বোঝেন।)

আমরা ঠাকুরের প্রতি গ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছি, ঠাকুর যত বড়ই সম্রাট হউন, তাঁহার কল্পনা সাতটি মাত্র। তিনি তাহারই একটি 'মেঘঝড়' নামক যাদুকরী কল্পনায় ফুৎকার দিলেন। অমনি আকাশ-মণ্ডল জলদ-মালায় আবৃত হইয়া গেল।—(তাই ভাবি, সে দিন যদি মেঘঝড় না উঠিত তাহা হইলে, কি করিয়া বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হইত। ঠাকুর কি লইয়া আজ সম্রাট হইতেন?) ঝড়ের সহিত বৃষ্টিও দেখা দিল। দুষ্ট ঝড় প্রথমতঃ রহমৎমোল্লার টুপি আর দাড়ীর উপর তাহার অসভ্য রাগ ঝাড়িল। তারপর সূর্য্যমুখীকে অলঙ্কার-বিবর্জ্জিতা করিবার মানস করিল। নগেন্দ্রনাথ পাকালোক, ভাবিলেন।—'আমি মরি ক্ষতি নাই, প্রাণের পত্নী বিধবা না হয়; দেশে যে এক মহা ঢেউ উঠিয়াছে, হয়তো আমার মরিবার আগেই, সূর্য্যমুখীর নেকা হইয়া যাইবে।' তিনি এই ভাবিয়া টপ্ করিয়া কাঁচা বাগাইয়া থপ্ করিয়া নৌকা হইতে নামিয়া, গ্রামপানে দৌড় মারিলেন।

নভেল ঠাকুরও নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এবার তিনি এক নিঃসহায় কন্যার অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে আলাই-বালাই বকিতে বকিতে চলিলেন। বৃষ্টির পর কিরূপে পাতায় পাতায় জল ঝরিতেছে; কিরূপে পক্ষী সকল ডানা হইতে জল ঝাড়িতেছে; পথের কোথায় কতটা জল জমিয়াছে।—চিত্রটি বেশ আঁকিলেন, স্বকীয় তালুকের চিত্র না আঁকিবেন কেন? মেঘ-ঝড় থামিয়া গেল তথাপি নভেল ঠাকুর নগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় না ফিরাইয়া তদীয় দ্বিতীয় তালুকে আসিলেন। ঐ তালুকের করস্বরূপ ঠাকুর একটি আশ্রয়বিহীনা কন্যা পাইয়া থাকেন। সেই কন্যাকে তিনি 'বিষবৃক্ষ' করিবেন বলিয়া, নগেন্দ্রকে নৌকায় না ফিরাইয়া, মেঘ-ঝড়ের শিরে আরোহণ করাইয়া, এই তালুকে আনিয়াছেন, এখানে যে কন্যাটিকে পাইবেন, সেই কন্যাটি তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' হইবে।

নগেন্দ্রনাথ গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিলেন। একস্থলে

অলক্ষ্যভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন; এক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া রূপবতী, তদীয় মৃত্যুশয্যাগত পিতাকে লইয়া, সেই নীরব-নির্জ্জন ভীষণাকৃতি ভগ্নকক্ষে বসিয়া, অপলক নয়নে পিতার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই বালিকার নাম কুন্দনন্দিনী। নগেন্দ্র সেই অলৌকিক রূপবতীর মনোমোহ রূপরাশি দেখিয়া, প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই জীর্ণকায় রোগীর প্রাণবায়ু তদীয় শীর্ণদেহ ত্যাগ করিল। নগেন্দ্রনাথ, সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই ত্রিলোক দুর্ল্লভ বালিকার ত্রিসংসারে কাঁদিবার লোকটিও নাই। একে যুবতী তায় রূপবতী, কাজেই নগেন্দ্র বাবুর দয়ার ভাণ্ডার তাহার প্রতি অবারিত-দ্বার হইয়া গেল। তিনি অতি প্রত্যূষে যাইয়া গ্রামবাসীদের নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন; তাহারা আসিয়া কোনুগতিকে সেই শবদেহের সৎকার করিল। (ঠাকুরের কল্পনা কি সুন্দর! ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেলেও ইন্দ্রিয়বিজয়ী নগেন্দ্রবাবু স্বীয় নৌকায় ফিরিলেন না। তিনি এক কপটপটু লম্পটের মত এক যুবতীবিভ কুটীরের কোণে, চোরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রাত কাটাইলেন। আবার প্রভাতে যখন তিনি, শবদেহের সৎকারের জন্য গ্রামবাসীদের নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে 'তুমি কে হে বাপু' না বলিয়া, তাঁহার কথামত শবদেহের সৎকার করিল ইত্যাদি। এইরূপ কথা বিশ্বাস করিতে-করিতে, আমরা আমাদের বিবেকাদি সত্য কল্পনা ও ধারণা সকলকে কি ভাবে বিনষ্ট করিয়াছি, তাহা কেহ চিন্তা করিতে পারেন কি?)

শবদেহের দাহ করিবার পর নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বা প্রধান চিন্তার উদয় হইল; 'এই বালিকার কি হইবে।' (ইহা দয়া না লালসা? দয়ার জন্য অন্ধ, খঞ্জ, কুলা, কানা, খোঁড়া, স্বদেশ-বিদেশে বিস্তর আছে; কিন্তু যুবতী রূপসী সে, আর সুলভসামগ্রী নহে, যুবতীর প্রতি দয়া না দেখাইলে স্বর্গে মুখ দেখান যায় কি?)

ঠাকুর বলিতেছেন। নগেন্দ্রের কথার প্রত্যুত্তরে গ্রামবাসীরা বলিল। "উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহই নাই।" (এখানে ঠাকুরের কথায় স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছে যে, সেই সমস্ত গ্রামবাসীরাই চণ্ডাল-নিকৃষ্ট-পাষণ্ড; সেই দুরবস্থাপন্না কন্যারত্নটিকে কেহই গ্রহণ করিতে চাহিল না। এমন অসঙ্গত কথা কেহ কখন শুনিয়াছেন কি?—ঠাকুর কেন বলিলেন না যে, 'গ্রামবাসীরা আমার কল্প-রাজ্যের প্রজা, পাছে আমার রঞ্জিত কল্পনা কাটিয়া যায়, সেইজন্য ঐ প্রজা সকল সেই কন্যাকে আশ্রয় দিতে চাহিল না। প্রজাদের গুণেই আমি সম্রাট!'—এরূপ

"তখন নগেন্দ্র কহিলেন—"তবে তোমরা কেহ একজন উহাকে গ্রহণ কর, উহার বিবাহ দিও, তাহার ব্যয় আমি দিব, আর যতদিন কুন্দ তোমাদের বাটীতে থাকিবে, ততদিন তাহার ভরণপোষণের জন্য মাসিক কিছু কিছু টাকা দিব।" নগেন্দ্র যদি কিছু নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত, পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে, কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্তা করিয়া রাখিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। (নগেন্দ্র এখানে কি বুদ্ধির কাজ করিলেন তাহা পাঠক বুঝিতে পারিলেন কি ? তিনি গ্রামবাসীদের কিছু কিছু উৎকোচ দিয়া কাজ সারিলেন। ঠাকুর এখানে ব্যক্তিগত নহে একখানা গ্রামের নিন্দা করিয়াছেন ; কাজেই সাধারণে মনে করিতে পারেন,—'তবে বুঝি হিন্দুরা ঐরূপ স্বার্থপর ও চণ্ডাল-নিন্দিত নির্দ্দয়জাতি।)

৩ * বিষবৃক্ষের বিবাহ। * ৩

যাহা হউক ঠাকুরের ইচ্ছায়, কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গলায় পড়িলেন ; তিনি তাঁহাকে লইয়া নৌকায় তুলিলেন। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে দেখিবামাত্র আতঙ্কিতা হইলেন। (স্বপ্নপটু নভেল ঠাকুর কুন্দকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি (নগেন্দ্র) দ্বারা তোমার অনিষ্ট হইবে।) কুন্দ ভয়বিহ্বলা হইলে, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে নানা কথায় বুঝাইলেন। '—কলিকাতায় তোমার মেসো আছে, ঠাকুরদাদার ঠাকুরঝি আছে, মামার পিসতুত সতীনপো আছে, তোমার চিন্তা কি ?'—কুন্দ তাহাই বুঝিয়া গেলেন। নগেন্দ্র কুন্দকে আনিয়া কমলমণির নিকট রাখিলেন। (ঠাকুর, মেসো দেখাইয়া অনেক অবলাকে চুরি করিয়া কলিকাতায় তুলিয়াছেন ; কুন্দকেও তুলিলেন।)

রূপরাগে রঞ্জিতা লঙ্কার কনকবর্ণা আম্রফলবৎ কুন্দনন্দিনী, কমলমণির নিকট কতিপয় দিন সুখ-স্বচ্ছন্দে রহিলেন। কমলমণি কুন্দের কথা সূর্য্যমুখীকে জানাইলেন। সূর্য্যমুখী তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে ভ্রূকুটি দেখাইয়া পত্র লিখিলেন। সুবাসিত আম্রফলটি পাইয়া নগেন্দ্রবাবুর রসনাসাগর বাণব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল ; সূর্য্যমুখীর পত্রখানি, তাঁহার সেই উদ্বেলিত বাঞ্ছা-তরঙ্গের উপর, যেন লাঞ্ছনার ভ্যালা ভাসাইয়া দিল। তিনি লজ্জায় অবনত মস্তক হইলেন। সূর্য্যমুখী আবার পত্র লিখিলেন।

নগেন্দ্র অগত্যা ভার্য্যার কথায় স্বীকৃত হইয়া কুন্দকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিলেন। নগেন্দ্রনাথের বিরাট ছয় দেউড়ী বাড়ী দেখিয়া, কুন্দনন্দিনী স্তম্ভিতা হইয়া পড়িলেন। সূর্য্যমুখী যে সত্যসত্যই, প্রত্যুৎপন্নমতি সুজ্ঞানগম্ভীরা রমণীরত্ন ছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। কুন্দকে হাতের মধ্যে টিপিয়া রাখা তাঁহার অসাধারণ চতুরতা বলিতে হইবে, এবং তাঁহাকে নিকৃষ্টা নারীদলভুক্তা করিয়া দেওয়া, সময়ের জন্য উচিত বুদ্ধির কার্য্য বলিতে হইবে।)

সূর্য্যমুখী কুন্দকে যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমতী নাম্নী এক কুলটার পুত্র তারাচরণের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তারাচরণ তিন বৎসরকাল কুন্দনন্দিনীর ভোগ-দখল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কাজেই কুন্দনন্দিনীকে আবার সূর্য্যমুখীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। (নভেল ঠাকুর কুন্দকে এইরূপে বিধবা সাজাইলেন। অর্থাৎ তাঁহাকে একটা বেশ্যাপুত্রভুক্তাবশিষ্টা করিয়া খাড়া করিলেন। এবং এইবার এই ফলটি নগেন্দ্রবাবুর রুচি প্ররোচক সামগ্রী হইল বলিয়া স্থির করিলেন। পাঠক—এইরূপ নভেল পড়িতে কিরূপ ঘৃণা জন্মায় সে অনুভবশক্তি আপনাদের আছে কি? এই আম্রফলটি নগেন্দ্রবাবু, অখণ্ড ও অভুক্ত অবস্থায় পাইয়াছিলেন; তখন তিনি এ ফল ভক্ষণ করিলেন না। একটা বেশ্যাপুত্র সেই ফলে ছোবল বসাইবার পর, নগেন্দ্রবাবুর রুচির দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি তখন সেই কুন্দনন্দিনীর জন্য প্রকৃত পাগল হইয়া পড়িলেন। এ ঝাঁটা কাহার মাথায় পড়িল সে চিন্তা কেহ করিতে পারেন কি? ঠাকুর বিধবার বিবাহ দিবেন বলিয়া কেমন একটি বিধবার জন্ম দিলেন দেখুন। তারাচরণ মরিলে কুন্দের সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জন্মায়। তারাচরণ কুন্দকে তাহার গ্রামবাসীদের দেখাইত। এবং যখন কুন্দ নীচ-কুলবধু ছিলেন, বাড়ীতে একাকিনী থাকিতেন, ধনপতি দেবেন্দ্র তাঁহার প্রতি আসক্ত—তখন কুন্দ সতী কি অসতী, যদি রাজবুদ্ধি থাকে তবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।)

জলন্ত অগ্নিশিখা সদৃশা কুন্দনন্দিনী, আর সেরূপ বক্ষবদ্ধা কমলিনী ছিলেন না। তিনি এখন প্রভাত-প্রস্ফুটিতা প্রসূনবৎ সুবাস বিভাসিতা রমণীরত্ন; সুর-রঞ্জিতা বার্ত্তাবাহী কুরঙ্গীনয়না; এখন তিনি নয়নের কোণে কথা কহিতে শিখিয়াছেন; এখন তিনি প্রেমিককে পাগল করিবার কল খাটাইতে পারেন। নগেন্দ্র সেই কুরঙ্গিনীর সুপ্রখর নয়নবাণে নিপতিত হইয়া স্বীয় সরল কলেবর দগ্ধীভূত করিলেন।

জীবনে 'নাথ' বলিবার সৌভাগ্যশালিনী হইবেন। কিন্তু তা বলিয়া তিনি আশা পরিত্যাগ করেন নাই। অন্তরের গভীর কোণে নগেন্দ্রনাথকে বসাইয়া গভীর-নীরবে পূজা করিতে কখনই ভুলিতেন না।

৪ * কালসর্প * ৪

কুন্দনন্দিনী যখন তারাচরণের স্ত্রী ছিলেন, তখন দেবেন্দ্রবাবু প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতেন। তিনি কুন্দের সুন্দর পদপঙ্কজে তাঁহার আত্মজীবন সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুন্দ এখন বিধবা, দেশেও বিধবা-বিবাহ চলিয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর প্রবল ইচ্ছা এই যে, তিনি কুন্দনন্দিনীকে পুণর্ভূ করিয়া এ জনমে একবার সুখের সংসার নির্ম্মাণ করিবেন। (নভেল ঠাকুরের কল্পনার দৌড় যতদূর, তিনি ততদূর দৌড়িয়া, মাথা ঘামাইয়া, পচাইয়া তায় বরফ-মাখন বসাইয়া, শেষ তাঁহার সুকল্পনামতে, দেবেন্দ্রকে এক জাল সন্ন্যাসিনী সাজাইলেন।) দেবেন্দ্রবাবু সন্ন্যাসিনী সাজিয়া কুন্দকে কৌশলে হস্তগত করিবার মানসে, একদিন নগেন্দ্র দত্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই (ঠাকুর তাঁহার পণ্ডিতবুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিতেছেন) মহলের মহিলাগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। দেবেন্দ্র তাহাদের গান শোনাইয়া ভিক্ষা লইলেন। পরে কুন্দনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া, এক ঘটি পানীয় জল চাহিলেন। কুন্দ জল আনিতেই সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"একটু সরিয়া আসিয়া আমার করতলে জল গড়াইয়া দাও আমি পান করি। তোমাদের ঘটি ছুঁইব না।" এই বলিয়া কুন্দনন্দিনীকে সামান্য নিভৃতস্থলে লইয়া গিয়া জলপান করিতে বসিয়া বলিলেন। "কুন্দনন্দিনী, তোমার শাশুড়ী শ্রীমতী তোমাকে একবার দেখিতে চাহিতেছে, তুমি গোপনে আমার সহিত চল। সে ভ্রষ্টা হইয়াছে বলিয়া এখানে আসিতে তাহার সাহস হয় না।" কুন্দ বলিলেন 'তিনি গিন্নিকে না বলিয়া যাইতে পারিবেন না।' (আমরা বলি কুন্দ সেই পূর্ব্বকৃত প্রেমিকের নিমন্ত্রণ একেবারে কাটিয়া দিতে পারেন নাই বলিয়াই সূর্য্যমুখী তাঁহাকে গৃহে স্থান দিতে চাহেন নাই।)

সুচতুরা সূর্য্যমুখীর জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুদ্বয় এড়াইয়া কাহার কোন কার্য্য করা সহজ-সাধ্য নহে। তিনি বিরলে দাঁড়াইয়া, কুন্দকে সেই বৈষ্ণবীর সহিত কথা কহিতে দেখিলেন। বৈষ্ণবীর প্রতি তাঁহার অকাট্য সন্দেহ জন্মিল। হীরা নাম্নী, সূর্য্যমুখীর এক

চমৎকারকারিণী দাসী ছিল। তিনি সেই হীরাকে ডাকিয়া এই বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর তত্ত্বাবধানে পাঠাইলেন। চতুরা হীরা কথাটির তত্ত্ব লইতে গিয়া, দেবেন্দ্রের প্রেম-জালে ফাঁসিয়া গেল। দেবেন্দ্র ভাবিলেন 'হীরামন তোতাটিকে না পুষিলে, সোণা-কানী ময়নাটিকে পাওয়া যাইবে না।' হীরা ভাবিল। 'দেবেন্দ্র তাহাকে পাইলে, কুন্দনন্দিনীর খেয়াল আর করিবে না।'

হীরা যথাসময়ে আসিয়া, সূর্য্যমুখীকে সংবাদ দিলেন যে, দেবেন্দ্রবাবু সন্ন্যাসিনী সাজিয়া কুন্দনন্দিনীকে হাত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। (এখানে হীরা এই-উদ্দেশে, দেবেন্দ্রের গুপ্ত কৌশল ও কার্য্য-কলাপগুলি, সূর্য্যমুখীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, যেন সূর্য্যমুখী কুন্দকে চোখে চোখে রাখেন, এবং দেবেন্দ্রকে আর এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দেন।) জ্ঞান-গম্ভীরা সূর্য্যমুখী, কুন্দ-দেবেন্দ্রের ভাব-ভঙ্গিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, এবং তত্ত্বাবধানে যাহা পাইলেন, এবং ইতিপূর্ব্বে কুন্দ ও দেবেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, সেই সকল কথা একত্র করিয়া ভাবিলেন। 'কুন্দনন্দিনীই আমার এই নির্ম্মলপুরী কলঙ্কে পরিপূর্ণ করিবে।—ওর স্বামীই ওকে ভ্রষ্টা করিয়া গিয়াছে।' সময়ান্তরে সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনীকে এই সকল কথার উপর তিরস্কার করিলেন, এবং তাঁহাকে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিবার আদেশ করিলেন।—ইতিপূর্ব্বেই কুন্দনন্দিনী ভাবিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমুখী থাকিতে তাঁহার মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে! তজ্জন্য একদিন অতি প্রত্যুষে (নভেল ঠাকুরের ইজারাকৃত কল্পনামতে) তিনি সরোবরে ডুবিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন। তিনি পুষ্করিণীতে নামিয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আনেন। এবং সেই সময়ে উভয়ে উভয়ের অন্তরপট দেখিতে পান, তাতে আরও দেখেন যে উভয়ের ছবিই উভয়ের অন্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই আশায় কুন্দ একাল পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন রাখিয়াছেন।—আজ সূর্য্যমুখী তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তিনিও আর সে বাড়ীতে থাকিবেন না।—তাঁহার ইচ্ছা 'যদি নগেন্দ্র তাঁহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখেন তবে তিনি নগেন্দ্রের মনোরঞ্জিনী হইয়া থাকিবেন। নচেৎ তিনি দেবেন্দ্রের আশ্রয় লইবেন কিন্তু তাহা ঘটিবার নহে।' (নভেল ঠাকুর কেমন আপন অভিরুচি মতে আপন কাটছাটে বিধবাটির জন্ম দিয়া, স্বকীয় অভি-সন্ধি সিদ্ধিহেতু তাঁহাকে পূণর্ভূ করাইতে দাঁড়াইয়াছেন। তারপর ইঁহাকে আত্ম-হত্যা করাইয়া, ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ বলিয়া দেখাইবেন। আবার ফাঁকে দাঁড়াইয়া বলিবেন। "যে ব্যক্তি বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

৫ ❋ কুন্দের পলায়ন। ❋ ৫

সূর্য্যমুখীর কথা কুন্দনন্দিনীর প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি নভেল ঠাকুরের ইচ্ছানুক্রমে অন্য এক কল্পনার আশ্রয় লইয়া, এক রাত্রে নগেন্দ্রের বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। তিনি নগেন্দ্রকে কোন কথা বলিয়া যাইবার মানসে, নগেন্দ্রের শয্যাগৃহের বহির্ব্বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তিনি জাগিলেন না। (যদি জাগিতেন তবে কুন্দ তাঁহাকে কি বলিতেন, পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারেন কি?—বলিতেন, 'আমাকে স্বতন্ত্র আবাসে রাখিয়া, সেইখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকুন।' পাছে কুন্দের মনের কথা প্রকাশ পায়, নভেল ঠাকুর তজ্জন্য তাঁহার কল্পনা-সুলভ মেঘ-ঝড়ের আহ্বান করিলেন।) অমনি তাঁহার কুহকময়ী মেঘমালা আসিল এবং কুন্দনন্দিনীকে সেই বাতায়নপার্শ্ব হইতে লইয়া গিয়া, সেই গ্রামের এক ঘরের বাড়ীর দাওয়ায় বসাইয়া দিল। (ঠাকুর কি সুন্দর প্রণালীর উপর বিধবা-বিবাহের বিপক্ষতা করিতেছেন। পাঠক তাহা বুঝিয়া যাইবেন। মিথ্যা সাক্ষীরা আদালতে দাঁড়াইয়া যে ভাবে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলিতে থাকে, ইহা অবিকল সেইরূপ কাঁচা মিথ্যা নয় কি?)

তরুণ বয়স্কা রূপবতী হীরা; পাছে পুরুষ সমাজে তাহার ঢল ঢল যৌবন ও লোকরঞ্জন মহিমার নিন্দাবাদ রটে;—পাছে কেহ মনে করে, সে বিধিদত্ত মধু পাইয়া জনসাধারণের প্রতি উদারচেতা নহে; সেই কারণে সে তাহার আয়ীবুড়ীকে অন্য এক ঘরে শয়ন করাইয়া নিজে একাকিনী স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করিত। (ঠাকুর হীরাকে সতী বলিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু নিশাসমাগমে তাহার দ্বারস্থ শিকল, কিরূপ রকমারি করস্পর্শে রকমারী শব্দ প্রকাশ করে, তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন? কখন—কিঠ কিট ঝিন, কখন—ঝিন কিন ঝনাৎ, কখন—ঝন ঝন, ঝন ঝন ঝাঁ। ইহা কি শিকলী, না বিধবার বার্ত্তাবাহী তারযন্ত্র? ঠাকুর এখানে কেমন সুন্দর-ভাবে, ভাবে ভাবে দেখাইয়াছেন যে, বিধবার এমন বার্ত্তাবাহী শিকলী থাকিতে, আবার তার বিবাহ কেন? কিন্তু পতঙ্গবুদ্ধি লোকেরা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিল কি?

ঠাকুরের ইচ্ছায় কুন্দনন্দিনী এই হীরার দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছেন। যে সকল বিধবা স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্র গৃহে একাকিনী শয়ন করে; ঘুমাইলেও তাহাদের কাণ জাগিতে থাকে। কুন্দ তাহার দ্বারে পিট দিয়া বসিলেই হীরার জাগ্রত কাণ সেই শব্দ পাইল। 'কোন মুখপোড়া আসিয়াছে' ভাবিয়া, দ্বার খুলিতেই কুন্দকে দেখিল।

রাখিল। যখন সে অন্যস্থানে যাইত তখন কুন্দকে ঘরে ভরিয়া বাহির হইতে তালাবদ্ধ করিয়া যাইত। (কুন্দকে ঠাকুর চোর না বলিলেও তাঁহাকে গারদে আবদ্ধা করিয়াছেন।—তাঁহাকে গারদাবদ্ধা করায়, আমরা বলি, হীরা তাঁহার নিকট লুচী-সন্দেশের হাঁড়ি রাখিয়া যাইত, তিনি গৃহাবদ্ধা হইয়া তাহাই খাইতেন।)

"সেদিকে নগেন্দ্র শুনিলেন কুন্দ পলায়ন করিয়াছে। তিনি একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সূর্য্যমুখীর উপর গরম হইয়া উঠিলেন। সূর্য্য ভাবিলেন, 'নগেন্দ্রনাথ আর তাঁহার মন্ত্রমুগ্ধ নাগ নহেন।' পরন্তু তিনিও স্বামীর সহিত কুন্দের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।—ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কেহ কুন্দকে আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

"সেদিকে দেবেন্দ্রবাবুও তলে তলে সংবাদ পাইয়াছেন যে,—কুন্দনন্দিনী এখন হীরার গৃহে লুকাইয়া আছে। হীরাকে ডাকিয়া বিস্তর পুরস্কার দিতে চাহিলেন। কিন্তু হীরা নিজে দেবেন্দ্রের জন্য মরিতেছে, সে কুন্দকে দিয়া ধন লইতে চাহিল না? (হীরা যেন দেবেন্দ্রের পুরস্কার লইবে না, নগেন্দ্রের পুরস্কারটা ছাড়িল কেন?—ছাড়িল কেন?—দেবেন্দ্র যে ঘর বহিয়া টাকা দিয়া যাইতেছে। আর কুন্দ যে নগেন্দ্রকেও ভুলিতে পারে না, দেবেন্দ্রকেও ছাড়িতে পারে না। দুটানায় পড়িয়া ঘরে খিল দিয়া সন্দেশ খাইতেছে। ঠাকুর রহস্যগুলি লুকাইতেও পারেন না, আর লুকাইতেও ছাড়েন না।—ঠাকুরের এজহার কেমন হইতেছে!)

কুন্দকে হাত করিবার জন্য, দেবেন্দ্র হীরাকে বিবাহ করিবার লালসা দেখাইলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, বিবাহ করিয়া হীরাকে আনিলে কুন্দ আপনিই তাঁহার ঘরে আসিবে, তখন তিনি হীরাকে তাড়াইয়া দিয়া কুন্দের প্রেমে প্রাণ ডুবাইয়া রাখিবেন। কুন্দ যখন জানিতে পারিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে বিবাহ করিবে, তখন তিনি আর তথায় থাকা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তিনি একদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নগেন্দ্রনাথের পুষ্পোদ্যানে যাইয়া বসিয়া রহিলেন।

৬ ✻ কুন্দের প্রত্যাগমন সূর্য্যের পলায়ন। ✻ ৬

প্রভাতে সূর্য্যমুখী কানন ভ্রমণে যাইয়া, নগেন্দ্রনাথের হৃদ্‌পিণ্ডরূপ কুন্দকে তথায় কুড়াইয়া পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে একপ্রকার আনন্দই জন্মিল। তিনি তাঁহাকে সাদরে তুলিয়া তথা হইতে গৃহে আনিলেন। 'কুন্দ এই

কথার সন্ধিহান কেহই হইল না এবং নভেল ঠাকুর কাহাকেও হইতে দিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের সতীত্বের উপর সন্ধিহান বলিয়া তিনি 'মূর্খ'। নভেল ঠাকুর পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, বাজারে লুচী-সন্দেশের দোকান বন্ধ হইয়া পড়িবে, পথিক ও বিদেশীরা লুচী-সন্দেশ পাইবে না, তেমনতর মূর্খের মত কার্য্য করেন নাই।)

পতিপরায়ণা সূর্য্যমুখী, কেবল স্বামীসুখে সুখিনী হইবে বলিয়া, সানন্দে কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়া তদীয় নিরেট ভালবাসার অকাট্য প্রমাণ দিলেন। তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া কন্যা-সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে আনন্দিতচিত্তে বিবাহের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, এবং বরকনেদ্বয়কে বাসরগৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া; যখন সমগ্র অন্তঃপুর নীরব হইল, তখন তিনি নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে এ জন্মের মত সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। (বলিহারি যাই, কল্পনা কি সুন্দর!—ঠাকুর মানুষ ছিলেন কি, কি! আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।—ঠাকুরই না সীতারামের তিন পত্নী এবং ব্রজেশ্বরের তিন পত্নী দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহই তো সতীন দর্শনে গৃহত্যাগিনী হন নাই। তবে এখানে, সূর্য্যমুখী এমন প্রত্যুৎপন্নমতি জ্ঞান-গম্ভীরা রমণী হইয়া, নিতান্ত ইতর রমণীর মত গৃহত্যাগিনী হইলেন কেন?—আহা মরি মরি, ঠাকুর কোথা হইতে এক উড়ো কল্পনা আনিয়া কেমন সুন্দররূপে ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ করিয়া দেখাইলেন। কেমন সুন্দর রূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বীয় সতীন বানাইয়া তাঁহার উপর রাগ ঝাড়িলেন।)

বুদ্ধিমতি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইবার পূর্ব্বে কি কোন চিন্তা করেন নাই? তিনি কি সাঁওতাল, ভীল, কোড়া, কুলীদের মত খেজুরপাতার বিছানা বগলে করিলেন, আর একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে কোনরূপ আতঙ্কের উদয় হইল না?—ঠাকুর এতবড় কথাটার কণামাত্রও প্রকাশ করেন নাই কেন?—আমরা বলি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একাকিনী তাঁহার নীরব কক্ষে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন!—

'আমি গৃহে থাকিলে আমার স্বামী, তাঁহার এই নববিবাহে ততদূর সুখী হইবেন না, আমি গৃহত্যাগিনী হইলে যতদূর হইবেন। এই হেতু আমার এখানে না থাকাই ভাল!—তা যেন গৃহত্যাগ করিলাম,—যাইব কোথা? নারীজাতি সহজে দুর্ব্বলা পুরুষ-স্পর্শে তাহার সতীত্ব থাকে না, তবে যাইব কোথা? কমলমণির নিকট গেলেও চলে?—না, সেখানে যাইব না,—তাহারা স্বামী-ভার্য্যা একত্র শয়ন করিবে, আমি

বৎ! নিশীথ তিমিরে, যদিই একটা ছীপ, বজরা বা পান্সী অলক্ষ্যে সেই নদীবক্ষ দিয়া পার হইয়া যায়, তবেই নারী জীবন বৃথা হইল! যদি বাড়ীর কুকুরটাই পায়ে আসিয়া শয়ন করিল, আর তাহা কেহ দেখিয়া ফেলিল, তবেই সর্ব্বনাশ। আর সকল চক্ষের অলক্ষ্যে থাকিয়া এককাজ কেন শতকাজ হইয়া গেলেও ক্ষতি নাই।—আপনার লোকের নিকট যাইয়া কাজ নাই। তাতে কানাকানি জানাজানি হওয়াই সম্ভব। নিরুদ্দেশে গিয়া সহস্র পাপ করিলেও দোষ হইবে না।—দোষ কেন, বরং স্বীয় রমণীজাতির গুণ-গৌরব বৃদ্ধি পাইবে এবং তখনই সে রুচিস্থ রসবতী হইবে; কুন্দ যখন কলিটি ছিল, তখন স্বামীকে বুঝাইতে পারিলাম, যখন সে পতির উপর উপপতি করিল, তখন সেই স্বামীকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। কুন্দ জোর দুই পাঁচটা উপপতি করিয়াছে; আমি যদি ঘরে ফিরি, দশবিশ গণ্ডা না করিয়া ফিরিতেছি না; দেখি স্বামী কুন্দের হয় কি আমার।'

কুন্দের তো দেশী (হিন্দু-কলেজের) পাশ, আমি বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার হইয়া আসিব। দেখি, কুন্দকে পরাভূত না করি কেমন! স্বামী বিদেশে যাইয়া কুন্দকে পাইলেন, আমি বিদেশে যাইয়া স্বামীর ন্যায় শত শত স্বামীর দর্শন অবশ্যই পাইব। তাহারাই আমাকে শিক্ষায় প্রেমপটু করিয়া দিবে। আমি শত শিক্ষকের ছাত্রী হইয়া, নিত্য নূতন শিক্ষা প্রাপ্তে শীঘ্রই সুমার্জ্জিতা হইয়া দাঁড়াইব। হীরক-হর্ম্মে বসিয়া পড়া না করিলে কি পড়া করা হয় না!—যখন পাশ করিবার ইচ্ছা আমাতে বল প্রকাশ করিয়াছে, তখন কি তৃণাসন, কি তরুতল শ্মশান, বা কি পর্ণাবাস, কি গিরি গহন, যেখানে শিক্ষকের দর্শন পাইব সেইখানেই পুস্তক খুলিয়া পড়া লইতে বসিব। প্রাণপণ পরিশ্রম না করিলে পাশ করিতে পারিব কেন?—শিক্ষকদিগের গোত্র বা কুল-কুলচী দেখিব কেন?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যমুখীর নয়নযুগল বারিপূর্ণ হইল। তিনি অঞ্চললোচনা হইয়া কতক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন।—"হায় হায় হায়, আমার অদৃষ্টে এই ছিল।"

সূর্য্যমুখী স্বীয় চক্ষে অঞ্চল চাপিলেন, নয়নজল নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিন্তা-স্রোত নিবৃত্ত হইল না। তিনি আবার ভাবিলেন,—"আমি চলিয়া গেলে নগেন্দ্রের পবিত্রকুলে কালি পড়িবে না?—গ্রামে গ্রামে তাঁহার জমিদারী, তিনি একজন জগদ্বিখ্যাত মানুষ, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাঁহার মান-সম্ভ্রমের সীমা নাই; তিনি কেমন করিয়া সকলের নিকট মুখ দেখাইবেন?—তিনি যেখানে যাইবেন, লোকে গোলাপ-

মালায় তাঁহাকে বিবিধরূপে সাজাইবে,—কপালে চন্দন না দিয়া চূণকালির ফোঁটা দিয়া দিবে। মাথায় বরফ না দিয়া ঘোল ঢালিয়া দিবে।—হয় তো আমার সাধের স্বামী সেই অসহ্য লজ্জা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হইবেন!—না, আমি কোথাও যাইব না।—কাহারও স্বামী কি পত্নীর উপর পত্নী করে নাই। তাহারা কি তাহাতে আমার মত গৃহত্যাগিনী হয়?—তবে আমি কেন হইব?—দুই-দিন পর কুন্দও কি আমারই মত পুরাতন হইবে না? তখন স্বামী যে, আবার আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে থাকিবেন।—তাঁহার নয়ন তাঁহাকে ঠকাইতেছে; তাঁহার এ ভ্রম কাটিতে অধিক দিন লাগিবে না।'

এই বলিয়া কতক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।—'আমাকে গৃহত্যাগিনী হইতেই হইবে।—আমরা কি হিন্দু? আমাদের জাতিকুল কোথায় যে তাহা নষ্ট হইবে। আমরা যে, নভেল ঠাকুরের বংশাবলী, আমরা যে দেশী মাথায় বিলাতী টুপি পরি।—হিন্দুদের উদ্‌ভ্রান্ত করিবার জন্য ঠাকুর আমাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মে জন্ম দিয়াছেন। সঙ্গতাসঙ্গতে কি বহিয়া যাইবে, বিদ্যাসাগরকে মূর্খ প্রমাণ না করিতে পারিলে আমাদের ঠাকুরবংশের গৌরব থাকিবে কেন? আমি যাইব, কুন্দ রহিল, স্বামী প্রাণ ত্যাগ করিবেন কেন? আমি তো তাঁর কোল শূন্য করিয়া যাইতেছি না!' আবার কতক্ষণ নীরব থাকিয়া চিন্তা করিলেন—'মিসিস টেম্পাল একদিন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে করিতে বলিয়াছিলেন।—"তোমরা যে 'হিন্দু-ধর্ম্মকে আদি ধর্ম্ম' বলিয়া গৌরব কর, সে কথা কি তোমাদের জীর্ণবুদ্ধির সাক্ষ্য দেয় না?—এই জগতের কোন্ আদি জিনিষটা ভাল যে, তোমাদের আদি ধর্ম্মটি ভাল হইবে?—ইক্ষু, একটা আদি দ্রব্য, তাহা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ইক্ষুরস, চিনি, মিশ্রি, মণ্ডা, মেঠাই হইয়াছে। ইক্ষু ভাল কি চিনি, মিশ্রি, মণ্ডা, মেঠাই ভাল?—দুগ্ধও একটা আদি দ্রব্য, কিন্তু দুগ্ধের মূল্য বেশী কি ছানা, মাখন, ঘৃতের মূল্য বেশী?—কার্পাস একটা আদি দ্রব্য, তবে কার্পাস কোমরে জড়াইয়া থাক না কেন? ধুতি শাড়ী, কাটাকাপড় পর কেন?—চাউল একটা আদি দ্রব্য, তাই ভিজাইয়া খাও না কেন? ভাত, পোলায়ে দরকার কি?—'আদি ধর্ম্ম বলিলে' যে অসভ্য বনজধর্ম্ম বলিয়া বুঝায়, বোধ হয় সে টুকুও তোমরা বুঝিতে পার না।"—আমরা ব্রহ্মজ্ঞ বা বিলাত ফেরৎ নহি, আমরা নভেল ঠাকুরের বংশাবলী; হিন্দুর ভাগে কল্পনারাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হিন্দু-ধর্ম্মের অবতারণা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সমগ্র

দিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি, অভিলাষ, কাণ্ডজ্ঞান, আচার-ব্যবহার যেমনই হউক, তাহাকে অতি কুৎসিত করিয়া দেখাইবার জন্যই আমাদের জন্ম। তাই, তিনি আমাদিগকে অতি উচ্চ ধরণে গঠন করিয়া লইবার পর, আমাদের সেই পবিত্র উচ্চ চরিত্রকে কলঙ্কের ঘৃণিত পঙ্কে ডুবাইয়া বিদূষিত করেন, এবং পরিশেষে সেই কুৎসিত চরিত্র সহ, আমাদিগকে আমাদের পবিত্রকুলে তুলিয়া দেন। এতদ্বারা নভেল ঠাকুর, সমগ্র হিন্দুকে ভাবে ভাবে ও আকার-ইঙ্গিতে বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মহিলারাও বিদূষিতা এবং পুরুষেরাও এমন উদ্‌ভ্রান্ত যে, ঐরূপ ঘৃণিত রমণী-দিগকে আবাসে স্থান দান করিতে ইতঃস্তত করে না। ফলকথা আমরা হিন্দু-সমাজের শয়তান,সমগ্র সম্প্রদায়কে কুপথগামী করাইবার জন্য,আমরা চমৎকারকারিনী সাজিয়া হিন্দু সকলকে ধূলিলোচন ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া থাকি। পরন্তু আমরাই তাহা-দিগকে উচ্ছন্নে দিতেছি, গোলামখানায় খাটাইতেছি, উৎকোচ-রক্ষা করিতেছি, জননী জন্মভূমির শত্রু করিয়া রাখিয়াছি, ভাই ভাইয়ে অবিরত দ্বন্দ্ব করাইতেছি, মিথ্যা ও পাপের কার্য্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছি, ধর্ম্ম ও ন্যায়-নিষ্ঠা ভুলাইয়া দিয়াছি। তাহারাও আমাদের উপাসক সাজিয়া, মায়ের নাম ভুলিয়াছে,পূজা দেওয়া ছাড়িয়াছে, এবং যাবতীয় অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক আমাকে গৃহত্যাগ করিতেই হইবে।" এইরূপ চিন্তার পর সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন।

৭ * সূর্য্যের ব্যারেষ্টারী শিক্ষা। * ৭

পরদিবস প্রভাতেই নগেন্দ্রবাবুর ভবনে এক অভূতপূর্ব্ব হট্টগোল পড়িয়া গেল। বিবাহ উপলক্ষ্যে বাবুর ছয় দেউড়ী বাড়ী আত্মীয়-স্বজনে নর-সমুদ্র প্রায় থই থই করিতেছিল। সেই জনতার মধ্যস্থলে এই কলঙ্কের হাঁড়ি ফাটিল। শ্রীশচন্দ্র এবং নগেন্দ্রনাথ, উভয়ে মিলিয়া সূর্য্যমুখীর বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন; এবং কথাটা গোপন রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোনদিকেই সফলকাম হইতে পারিলেন না। কথাটা যেন ঘূর্ণিত পবনে পড়িয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে খেলাইতে খেলাইতে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। তখন তাহা চাপা দিবার জন্য (সম্রাটী-কৌশলসুলভ) এক হুজুগ তুলিয়া দিলেন। সূর্য্যমুখী একটা বনের মধ্যে লুকাইয়া-ছিল; তাহাকে পাওয়া গিয়াছে। সে তাহার সইয়ের বাড়ী গিয়াছে, পাঁচ দিন পর বাড়ী আসিবে। এইরূপ বলিয়া উত্থিত তরঙ্গরাশির শমিত করিতে কি সে

নর-সমুদ্রে যেন কটালের বান ডাকিয়া উঠিল (পানে পোকা, ঐ ছেলে ধরা ঐ সূর্য্য-মুখী আর এই বন্দেমাতরম্, এ সকল একই ধরণের হুজুগ। ইহাকে পতিত বুদ্ধিগত হুজুগ বলে। ইহার উৎপত্তির স্থল বাঙ্গালীর দাসবুদ্ধিভরা মাথা।)

ক্রমশঃ বাড়ীর ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন। "বল ভাই! আমি কি করিয়া সমাজে মুখ দেখাইব?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন। "ভাই. আমি আগেই বলিয়াছিলাম 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" নগেন্দ্রনাথ বলিলেন। "ভাই, ঐ কথাটি হিন্দু রচিত হইলেও, হিন্দুরা ও কথার অনুবর্ত্তী হইতে শিক্ষা পায় নাই।—কোন এক কার্য্য করিবার পূর্ব্বে, সে কার্য্যের ভাবীফল বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই; তা' হলে কি, এই সোণার ভারত বিদেশীর পদে বিদলিত হয়! আমরা চিরকালই করিয়া পস্তাই। ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার আগে আমাদের মাথায়, চিন্তা করিবার বুদ্ধি দেন নাই। তাই আমরা সেরূপ উপদেষ্টাকে পাগল মনে করি।—এখন কি করি বল?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন। "উপায় যাহা, তা তো তুমি নিজেই বুঝিয়াছ। যখন হিন্দুরা ভাবা-চিন্তা না করিয়া এক কাজ করায়, এত বড় রাজ্যটা ইংরেজরা কুড়াইয়া পাইল; আর তুমিও যখন না ভাবিয়া এক কাজ করিয়াছ, তখন তোমার এই সূর্য্যমুখীরূপ রাজ্যটাও কোন বিদেশীর কপালে ফলিয়া যাইবে।—তুমি যাহাকে চাও যখন তাহাকে পাইয়াছ, তখন সূর্য্যমুখী সম্বন্ধে মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দাও যে, সে মরিয়া গিয়াছে।"

নগেন্দ্র দত্ত সচিন্তচিত্তে, বারিপরিপ্লুত নয়নে শ্রীশচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন। "সে মরিলে, পোড়া প্রাণকে সহজেই প্রবোধ দিতে পারিতাম। সেই স্নেহমায়ায় গঠিত ভালবাসার প্রতিমা স্বরূপ সূর্য্যমুখী বড়ই কোমলাঙ্গী রমণী; কখনও একটি ফুটন্ত পুষ্প ফেলিয়াও তাহাকে প্রহার করি নাই। সেই কুসুম-বিনিন্দিত কমলবদনা নারীরত্ন, কোথায় মাঠে, ঘাটে, হাটে, নগ্নপদে, নিরাহারে কোড়া-কুলী-কন্যাপ্রায় ঘুরিতেছে! কাল-নিশা সকল আসিতেছে যাইতেছে, আহা সে আমার কোথায় পড়িয়া কি ভীষণ অবস্থাতেই সেই সকল কাল-নিশা পোহাইতেছে।—কর্দ্দমময় পুষ্করিণীর উত্তপ্তজলে পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তিতে পেটু পালিয়া; না জানি তাহার কোমল প্রাণে কতই কষ্ট হইতেছে। পথ চলিতে যদি, কোন দুষ্ট চোওয়াড় বা লাঠিওলা কাবলীর চোখে পড়িয়া যায়, সেই জঙ্গমান গোঁড়েগোবিন্দের

হাত এড়ান কি সহজ ব্যাপার হইবে। এই সকল কথা স্মৃতিপথে উদয় হইলে, মনকে প্রবোধ দিবার কোন উপায় থাকে কি ?"

(নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের উপদেশ না শুনিয়া এই বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র তাই তাঁহাকে সামান্য তীব্রস্বরে বলিলেন। "না হয় সে, কোন চোওয়াড়াঙ্গ পুরুষের কঠিন আলিঙ্গনে পড়িয়া পুঁটি মাছ টেপা হইয়া মরিবে ;—তোমার তায় ক্ষতিবৃদ্ধি কি ?—তোমার গলার পাপ নামিয়াছে, তুমি এখন স্বচ্ছন্দ হইয়াছ—পাপের জন্য আবার চিন্তা কেন ?—রোদনই বা কিসের ?")

নগেন্দ্র সজল নয়নে বলিলেন। "আমার তায় ক্ষতিবৃদ্ধি কি ?—তাই তুমি এমন কথা বলিলে !—আমার তায় কি ?—আমি কি সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ করিয়াছি বা তাহাকে ভালবাসিতে অস্বীকৃত হইয়াছি।—আমি কি তাহার বিনা অনুমতিতে এই অপরাধ করিয়াছি ? আর আমি যে অপরাধ করিয়াছি, এ অপরাধ কি কেহ কখনও করে নাই ? একবৃন্তে দুই ফুল কি কোন কাননে ফোটে না ?"

শ্রীশচন্দ্র। "ঐ উদাহরণেই মরিয়াছ ! একবৃন্তে দুই ফুল ফোটে সত্য, কিন্তু ঐ কথাটা কি দুই সতীনের উদাহরণে দাঁড়াইতে পারে ?—এক সূতায় দুইটা ঘুড়ি উড়িতে দেখিয়াছ কি ?—যদিও উড়ে তবে তাহা কি ভাবে উড়ে,—একটা উড়ে একটা পড়ে, একটা ঘুরে একটা মাথা খোঁড়ে। সেই সতীনদ্বয় এইরূপে কে কত খেলা খেলে, একবার তাহা ভাবিয়া দেখ দেখি ?—জোড়া-ঘুড়ি সামলান কি আমাদের কার্য্য ?—অন্য একটি সূতাকাটা ঘুড়ি আকাশ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তুমি তোমার ঘুড়ি গ্রথিত ডোর দিয়া তাহাকে জড়াইতে গেলে কেন ?—জড়াইতে গিয়া তোমার নিজ ঘুড়ির ডোর কাটিয়া গিয়াছে। এখন আর তাহার জন্য কাঁদিলে কি হইবে ? সে যে, পথের ত্রিশূলপাণি ছোঁড়াদের হাতে পড়িয়া হাড়েমাসে গুঁড়াইবে তাহা স্থির নিশ্চয়।—সে খেয়াল ছাড়িয়া এখন যাতে কুন্দটি রক্ষা পায় সে চেষ্টায় থাক। মনে রাখিও তোমার এবং তার সূতায় এখন গ্রন্থি পড়ে নাই।"

নগেন্দ্রনাথ আর কিছু বলিতে না পারিয়া শ্রীশচন্দ্রের চরণ ধরিয়া, প্রবল বেগে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবু তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিবার মানসে বলিতে লাগিলেন। "তুমি বালকের মত, অত রোদন করিতেছ কেন ? তুমি সূর্য্যমুখীর মহিমা বোঝ না তাই ভয় পাইতেছ। সূর্য্যমুখী গঙ্গার ন্যায় যেমন পবিত্র কলেবরা, তেমনি পতিপরায়ণা আবার তেমনি দুষ্টবুদ্ধি। পিত্রালয়রূপ গিরি কন্দর হইতে নির্গত হইয়া, নানাদেশ নানা ভূ পর্য্যটনকারিণী গঙ্গা যেমন নানাজাতীয় ...

শ্রীমুখ বিধৌত করিয়াও অপবিত্রা নহে ;—সেই ভয়ঙ্কর ক্রোধকারিণী চণ্ডালরূপা গঙ্গা, যেমন সহস্র সহস্র চোওয়াড়, সদসৎ ব্যক্তিকে জলে নিমজ্জিত করিয়াও কলঙ্কিনী বলিয়া অবজ্ঞিতা নহে ;—সেই জগতোৎফুল্লকারিণী জীবপালিকা গঙ্গা, যেমন প্রেমোৎক্রোশে বিবশা হইয়া, আঙ্গালোজ্জ্বন করতঃ দূর প্রেমিকের মিলন সাক্ষাতে পরিতৃপ্তা হইয়া, আবার ধীরচিত্তে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় বন্ধনমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া, সুধীর গমনে পতিনিকেতনে গমন করিয়া থাকে ; তোমার সূর্য্যমুখীও তেমনি, অকাতরে প্রেম বিলাইয়া, পথে-বাটে মধু বিতরণ করিয়া, আবার তোমারই বন্ধন মধ্যে প্রবিষ্টা হইবে।—এতে তোমার বা সূর্য্যমুখীর কোনই দুর্নাম রটিত হইবে না। —যদি হয় তুমি আমার চোদ্দপুরুষের নাম ধরিয়া গালাগালি দিও।—তুমি দেখিও সূর্য্যমুখী হিন্দু-সমাজের পাশকরা দেবী হইয়া আসিবে। সে যদি বাহিবার হয় আমার বাড়ী হইয়া যাইত ; আমি তোমার ভগ্নিকেও তার সঙ্গে পাশ করিতে পাঠাইতাম। উভয়েই বারিষ্টার হইয়া আসিত।”

শ্রীশচন্দ্রের প্রবোধ বাক্যগুলি নগেন্দ্রকে অধিকতর শেলবিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি স্মৃতির নয়নে বিভীষণ দর্শন করিতে লাগিলেন ;—যেন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া, নানাস্থলের ইতর-জাতীয়-লোকেরা নানাপ্রকারে অপমান করিতেছে।—আবার দেখিলেন, যেন কতকগুলা গোরা শিকার করিতে আসিয়া, একস্থানে সূর্য্যমুখীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মধুর আলাপে মনপ্রাণ মধুরীত করিতেছে। পরিশেষে, বিদায়ের সময়, তাঁহার হাতে কিছু অর্থ দিয়া বলিতেছে। “Sweet darling! we shall meet you again, next Sunday. Ta Ta dear!” নগেন্দ্র আবার তাঁহার কল্পনার ভাণ্ডারে দেখিতে পাইলেন যেন, কতকগুলা হামাজামা-পরা কাবুলী, সূর্য্যমুখীকে এক নির্জ্জন জলের ঘাটে ধরিয়াছে। সূর্য্যমুখী কাবুলী দেখিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা হইয়াছে।

(নভেল ঠাকুরের দুষ্টকল্পনা সকল পাঠ করিয়া ইদানীন্তন মুসলমানদের মাথাতেও মন্দকল্পনা জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। নভেল ঠাকুর যেমন স্বীয়জাতিগত রমণীদিগকে অসতী করিয়া দেখাইয়াছেন, ইঁহারাও তাঁহার অনুকরণ করিতে ধরিয়া, পবিত্র এস্‌লামকুলে কালিমার সঞ্চার করিতেছেন। ‘মোস্‌লেম-সাহিত্য-সমিতি’টা তবে কিসের জন্য গঠিত হইয়াছে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না ?)

এইরূপ খেয়াল দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িল। তিনি শ্রীশচন্দ্রকে আর কিছু না বলিয়া একাকী কাছারীর দিকে গমন

করিলেন। দেওয়ানজির হাতে জমিদারী এবং মহলাদির আদায়-পত্রের ভার দিয়া তিনি একাকী সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে যেখানে কাবুলীদের আড্ডা সে সকল স্থল তন্ন-বিতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোন আড্ডাতেই তাঁহার পাতা পাওয়া গেল না। (ঠাকুরের ইচ্ছা না হইলে পাইবে কি?)

৮ ❀ স্ত্রীর অনুসন্ধানে বায়ু সেবন। ❀ ৮

সেদিকে দেবীপুরের দেবেন্দ্রবাবু, কুন্দনন্দিনীর গৃহশূন্য দেখিয়া হীরার আদর করিতে লাগিলেন। অবশেষে, হীরাকে স্বীয় আদেশের দাসী করিয়া রাখিবার মানসে (নভেল ঠাকুরের আদেশ মতে এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রথা মতে) তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন। (পাঠক বুঝিয়া যাইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের তাৎপর্য্যগুলি, কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়া, ঠাকুর কি ভাবে বিধবা-বিবাহ দিয়া, কি ভাবে তাহাতে বিষফল ফলাইয়া ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ বলিয়া গোলামবুদ্ধি জনসাধারণকে ধুলি-লোচন করিতেছেন!)

হীরাকে বিবাহ করিয়া, দেবেন্দ্রবাবু, কুন্দনন্দিনীকে আনিয়া দিবার জন্য তাহার প্রতি পীড়ন করিতে লাগিলেন। হীরা দেবেন্দ্রকে বিবাহ করিয়া বিষম জ্বালায় পড়িয়া গেল। অষ্ট প্রহর পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে সে বিষপান করিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের মর্ম্ম সুকল, ঠাকুর যে তাঁহার হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তিনি এই দুইটি বিধবার বিবাহ দিয়া বেশ প্রমাণ দিয়াছেন।—ঠাকুর তুমি যদি ইক্ষু চিনিতে, তাহা হইলে আমরা গরল খাইয়া মরি কি?)

হীরা একস্থল হইতে গরল সংগ্রহ করিয়া আনিল। বিষ ভক্ষণকালে তাহার চিন্তার উদয় হইল; সে ভাবিল, 'আমি কেন বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে জ্বালাতন করিতেছে, মদের সঙ্গে মিলাইয়া তাহাকেই এ বিষ খাওয়াইব।' পরন্তু সে, সেই বিষ কৌটায় মোড়ক করিয়া তুলিয়া রাখিল। কিন্তু সময়ান্তরে তাহার চিন্তা-স্রোত মুখ ফিরাইল, তখন সে ভাবিল; "আমি স্ত্রী হইয়া স্বামী হত্যাই বা করিব কেন? যাহার জন্য আমার স্বামী এরূপে পাগল হইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করি-

লাগিবে। আমি নির্ব্বিবাদে আপন রাজ্য আপনি ভোগ করিতে পারিব।" এইরূপ স্থির করিয়া হীরা কুন্দের সর্ব্বনাশ অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

(পাঠক, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যে রাত্রে কুন্দনন্দিনীর পিতা মরিয়াছিল, সেই রাত্রে নভেল ঠাকুর কুন্দনন্দিনীকে এক অপরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন। সেই স্বপ্নে কুন্দের স্বর্গীয় মাতা ঠাকুরাণী আকাশে বসিয়া, কুন্দকে দুইজন নরমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন নগেন্দ্রনাথ, অন্যজন হীরা। হীরাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন। 'এই শ্যামাঙ্গী, নারীবেশে রাক্ষসী, ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।" কিন্তু হীরা যে কুন্দের প্রতি কি এমন রাক্ষসীর কার্য্য করিল, তাহা আমরা ঠাকুরের জটিল কল্পনারাশি মন্থন করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। কুন্দনন্দিনী স্বেচ্ছায় এবং স্বহস্তে বিষ পান করিয়া মরেন। হীরা সে বিষ আনিয়া দিয়াছিল, দেখাইবার জন্য মাত্র, হীরা সে বিষ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে বলে নাই, বরং বুঝাইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি কিসে অপরাধিনী না হইলে বিষ খাইবে কেন?'—ভাল, যেন বিশ্বাস করিলাম যে, হীরাই কুন্দকে ছল করিয়া বিষ খাওয়াইয়াছিল।—এবং তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুন্দ মরিলে সে তাহার স্বামীকে পাইবে।—তবে কুন্দকে মারিয়া হীরা তাহার স্বামীকে ফেলিয়া পলায়ন করিল কেন? শেষে পাগলিনীই বা হইল কেন?—কেন আর, নইলে ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ, প্রমাণ করা যাইবে কেন? (যে ভাবে বুঝাইলে পতিত বুদ্ধিগত ব্যক্তিদের নিকট যশোলাভ করা যায়, ঠাকুর এখানে অবিকল সেই ভাবেই বুঝাইয়াছেন।)

নগেন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে যে সকল পত্র পাঠাইতেন, তাহা দেওয়ানজির নামেই পাঠাইতেন। কুন্দনন্দিনীকে একখানিও পত্র দিতেন না। (এখানে ঠাকুর কেমন সুন্দররূপে হিন্দুর স্বভাব-চরিত্র আঁকিয়াছেন। শিশুবুদ্ধি হিন্দুরা নয়নের প্রলোভনে পড়িয়া, কুন্দের মত পুতুলটিকে পাইবার জন্য, নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়া, হাত-পা ছড়াইয়া কাঁদিয়া থাকে; আবার যখন সে, সেই পুতুলটি পায়, তখন তাহাকে লইয়া পাঁচ দণ্ডের খেলা খেলিয়া, আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেয়। অর্থাৎ হিন্দুর দূরবীক্ষণ বুদ্ধি একেবারে নাই। নিরেট মূর্খেরা যাহা বুঝিতে পারে হিন্দু পণ্ডিতেও তাহা বুঝিতে পারে না। তাই বলি ঠাকুর, হিন্দু যদি তাই বুঝিত, তাহা হইলে ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ প্রমাণ করা যাইত কি? আপনার এইরূপ সহস্র দোষ মার্জ্জনা করিয়া একমাত্র ভাষার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনাকে কি সাহিত্য সম্রাট উপাধি দিত?)

কুন্দনন্দিনী স্বামীর সমাচার পাইতেন না, হীরা তাঁহাকে সমাচার পাইবার

কৌশল বলিয়া দিলেন ; "তুমি দেওয়ানজির নিকট হইতে পত্র লইয়া পড় না কেন ?" কুন্দ দেওয়ানজির নিকট হইতে পত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই সূত্রে দেওয়ানজির সহিত কুন্দনন্দিনীর পত্রাদির আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। হীরা সে বুদ্ধির গুপ্তভেদ যেন জানিয়াও জানিত না। কুন্দনন্দিনী মহিলা-মহলে একাকিনী বাস করিতেন। দেওয়ানজির সহিত আলাপ করিতে তাঁহার কোনদিকেই বিঘ্ন ছিল না। (নভেল ঠাকুর কুন্দের এই অবিশ্বাসিতাটি লুকাইয়াছেন, কিন্তু গভীর গোপনে রাখিতে পারেন নাই।)

নগেন্দ্রনাথ, কোনরূপেই সূর্য্যমুখীর উদ্দেশ পাইলেন না। (আমরা বলি, তিনি সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানেই ছিলেন না। তবে নভেল ঠাকুরের কল্পনা বজায় রাখিবার জন্য, এবং দেশের লোকের নিকট দোষ কাটাইবার জন্য, এরূপে তাঁহাকে মধুপুরের সমীরণ-সেবনে যাইতে হইয়াছিল।—তিনি যদি সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে থাকিতেন, তাহা হইলে কথাটা পুলিষকে জানাইতেন এবং সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিতেন। এবং তাহা করিলে, সূর্য্যমুখী যে ধরা পড়িতেন না, সে কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, ঠাকুর বলিতেছেন—সূর্য্যমুখী এক [illegible] পরিবারবর্গের [illegible] পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।—কলিকাতা পর্য্যন্ত [illegible] কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক ট্রেণ। সেখান হইতে সে স্বামীকে দেখিবার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। (ঠাকুরের পলাতক মেয়েদের জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সর্ব্বদা পথে প্রস্তুত থাকে।)

নগেন্দ্রনাথ মধুপুরে যাইয়া দেওয়ানজির নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। সেই পত্রের সহিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মা নামক এক ব্রহ্মচারীর একখানা পত্র ছিল। সেই পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে সূর্য্যমুখী অবস্থান করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ হরমণির গ্রামে গেলেন। (পাঠককে বলিয়া রাখি!—এই হরমণি একটা উপপতিকে লইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করিত, নভেল ঠাকুর এ কথাটি তাঁহার জটিলোক্তির মধ্যে লুকাইয়া, আমাদের এইরূপে প্রতারিত করিতেছেন :—)

"সূর্য্যমুখী বলিতেছেন। 'যে দিন আমি ব্রহ্মচারীর সহিত হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনই তাহার গৃহ দাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহ মধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। সেই দগ্ধ দেহ দেখিয়া গ্রামের লোক মনে করিল, হরমণি পলাইয়াছে যোগিনীটা পুড়িয়া মরিয়াছে। (এ কথাটি ব্রহ্মচারী জানিতেন না, সূর্য্যমুখী জানিলেন

কি করিয়া?—পাঠক এ কথাটা কেমন! বিশ্বাসযোগ্য বটে? যাহার গৃহে আগুন লাগে, সে চারিদিক চীৎকার করিয়া লোক জাগায়, অথবা সে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে?—গ্রামের লোকেরা কি গাঁজাখোর ছিল যে, হরমণি পলায়ন করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিল।—ঠাকুর যেন আমাদের কাণ ধরিয়া মামার বাড়ী দেখাইতেছেন। আশ্চর্য্য এই যে আমরাও তাই দেখিতেছি।—আমরা বলি :—)

সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইয়া, নানা দেশ পর্য্যটন করিলেন। পথিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বেচ্ছাচারিতা ও বহু ব্যক্তির প্রেম লাভ করিয়াও তাঁহার সুখ হইল না। অবশেষে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। পথ পর্য্যটন করিতে করিতে একস্থলে ক্লান্তা হইয়া পথের ধারে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। সন্ধ্যার পর তাঁহার চেতনা হয়। চাহিয়া দেখেন তাঁহার পার্শ্বে এক ব্রহ্মচারী বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন।—উঠিয়া বসিয়া সেই জাল ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, 'সকল প্রেম করিলাম ব্রহ্মচারীর মুখ পোড়ান হয় নাই।' তখন তিনি সেই ব্রহ্মচারীর সহিত প্রেমালাপ করিলেন। ব্রহ্মচারী সূর্য্যমুখীর প্রণয়ে বড়ই মধু পাইলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া কয়েক দিন ধরিয়া বনে বনে বেড়াইলেন। সূর্য্যমুখী সেই কয়দিনেই ব্রহ্মচারীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রণয়ে প্রণাম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। চতুর ব্রহ্মচারী তাঁহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হরমণি নামে তাঁহার উপপত্নীর বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং হরমণিকে বলিলেন— "এই রমণী পীড়িতাবস্থায় পথের ধারে পড়িয়াছিল। ইঁহার চিকিৎসা করাইব বলিয়া তোমার আশ্রয়ে একে আনিয়াছি। হরমণি বৈষ্ণবী, জাল সন্ন্যাসী শিবপ্রসাদের কথা বিশ্বাস করিয়া সূর্য্যমুখীকে তাহার গৃহে স্থান দিয়া রাখিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে জানিতে পারিল যে, সূর্য্যমুখী পীড়িতা নহেন, তাহারই উপসতীন।—তখন সে, সূর্য্যমুখীকে তাঁহার স্বামীসদনে পাঠাইয়া দিবার জন্য, শিবপ্রসাদকে বারংবার বলিতে লাগিল। শিবপ্রসাদ অগত্যা নগেন্দ্রনাথকে পত্রদ্বারা 'হরমণি বৈষ্ণবীর বাটিতে তাঁহার স্ত্রী আছে' বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নগেন্দ্র আসিবার পূর্ব্বে সূর্য্যমুখীকে লইয়া, যে কৌশলে তিনি পলায়ন করিবেন, তাহার পন্থা আবিষ্কার করিয়া লইলেন।—একদিন নিশার গভীরে পাপিষ্ঠ শিবপ্রসাদ সূর্য্যমুখীকে সঙ্গে লইয়া এবং হরমণিকে নিদ্রিতাবস্থায় গৃহাবদ্ধা করিয়া, ঘরখানিতে আগুণ দিয়া পলায়ন করিলেন।—সূর্য্যমুখী দেখিলেন তাঁহার সহস্রাধিক

সঙ্গে করিয়া গ্রাম হইতে অনেক দূরে যাইয়া, তাঁহাকে এক নির্জ্জন স্থলে বসাইয়া, বলিলেন। "তুমি ক্ষণকালের জন্য এই স্থানে অবস্থান কর, আমি এখনি আসি।" এই বলিয়া, শিবপ্রসাদ গ্রামের দিকে গমন করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হরমণির গৃহ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীরা হরমণির পোড়া অস্থি-পঞ্জর ভস্মরাশি হইতে পৃথক করিয়া, তাহা সূর্য্যমুখীর, অথবা হরমণির পঞ্জরাস্থি তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। শিবপ্রসাদ বলিলেন—'হরমণি তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছে; আমি তাই শুনিয়া, সূর্য্যমুখীকে কাহার নিকট রাখিয়া গেল, জানিবার জন্য গ্রামে আসিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি হতভাগিনী সূর্য্যমুখীই এইরূপে পুড়িয়া মরিয়াছেন।—শিবপ্রসাদের এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে,—যদিই নগেন্দ্র-নাথ তাঁহার পত্র প্রমাণ সূর্য্যমুখীর জন্য গ্রামে আসেন, তিনি সূর্য্যের পুড়িয়া মরা সংবাদ পাইলে, আর তাঁহার অনুসন্ধান করিবেন না। সে অবস্থায় তিনি সূর্য্যমুখীকে চির-কালের জন্য পাইয়া যাইবেন।

আমাদের নভেল ঠাকুরের মত সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীরাও শিবপ্রসাদকে ধর্ম্ম-পরায়ণ সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী বলিয়া মান্য করিত। তাঁহার কথা তাহারা অবিশ্বাস করিল না। সেদিকে সূর্য্যমুখী ব্রহ্মচারীকে কদলী প্রদর্শন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া সূর্য্যমুখীকে আর সেখানে দেখিতে পাইলেন না। এদিক-সেদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি গোবিন্দপুরে আসিলেন। সেখানেও সূর্য্যমুখীকে দেখিতে না পাইয়া, কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের নিকট গেলেন। এবং শ্রীশবাবুর নিকট সূর্য্যমুখীর পর্য্যটন সম্বন্ধে বিবিধ কাল্পনিক গল্প শোনাইয়া চলিয়া যান। (নগেন্দ্রকে পত্র দিবার পর, শিবপ্রসাদ সূর্য্যমুখীকে লইয়া কি উদ্দেশে কোথায় যাইতেছিলেন, সে কথা পতিতবুদ্ধি পাঠকেরা বুঝিবেন কি? যদি নিজেই তাঁহাকে বাড়ী পৌছিয়া দিবেন তবে নগেন্দ্রকে ডাকিলেন কেন?)

৯ * পাশকরা ভার্য্যা। * ৯

এই দুষ্ট শিবপ্রসাদ যদি সত্য ব্রহ্মচারী হইবে, আর সে সূর্য্যমুখীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাঁহাকে এক স্থলে রাখিয়া আসিবে, তবে সে, সে কথা গোবিন্দ-পুরেও জানাইল না এবং শ্রীশবাবুরও নিকট গোপন করিল কেন? সে সূর্য্যমুখীর জানায় সকল কথাই শ্রীশকে বলিল, কিন্তু তাঁহাকে কাহার বাড়ীতে কোথায় রাখিল,

এই মূল কথাটা লুকাইল কেন? ব্রহ্মচারীর এ কেমন ভণ্ডামী! নভেল ঠাকুর বলিয়াছেন যে, 'এই সন্ন্যাসী সূর্য্যমুখীকে কোলে করিয়া, হরমণির গৃহে লইয়া গিয়াছিল।' পরস্ত্রীকে কোলে করিলে তার কি পাপ নাই?—তবে সূর্য্যমুখী বাড়ী আসিবার দিন, রাত করিয়া ঠাকুরকে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন কেন? তাঁহারা হরমণির ঘর হইতে বাহির হইলেই সে দিকে তার ঘরে আগুন লাগিয়া সে পুড়িয়া মরিল কেন? আর এই ঠাকুর ঠাকুরাণীদ্বয় সেই ঘর পোড়া সম্বন্ধীয় অজ্ঞাত কথাটা কেমন করিয়া জানিল? শিবপ্রসাদই বা পথ হইতে গ্রামে আসিল কেন?'

আমরা বলি—'সূর্য্যমুখী সেই দুষ্ট শিবপ্রসাদের হাত হইতে পলায়ন করিয়া গোবিন্দপুরের নিকটবর্ত্তী একস্থলে আসিয়া, একাকী গ্রামে প্রবেশ না করিয়া, এই তাঁহার বিলাত-পাশকরা-বুদ্ধি-বলে, কোন এক গৃহস্থের বাড়ী লুকাইয়া থাকেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কিছুদিন তথায় থাকিবার পর বাড়ী যাইয়া বলিবেন যে, তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া অবধি ঐ স্থলে বাস করিতেছিলেন। এবং এইরূপে তিনি এক বৎসরকাল পরগৃহে বাস করিয়া, তাঁহার নববিবাহিত স্বামীর প্রতি ভক্তি দেখাইয়াবেন।'—ঘটনাক্রমে কথাটা অন্যরূপে দাঁড়াইয়া গেল। গোবিন্দপুরে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল।—তখন পাশকরা সূর্য্যমুখী মনে মনে এক নূতন কৌশল আঁটিয়া ফেলিলেন।—যে দিন নগেন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই রাত্রে সূর্য্যমুখী গোবিন্দপুরে আসিয়া, গোপনে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং একস্থলে লুকাইয়া রহিলেন, নগেন্দ্র শয়ন করিলে, এবং আবাসবাসীরা সুষুপ্ত হইলে, সূর্য্যমুখী ধীরে ধীরে সিঁড়ীর নীচু হইতে বাহির হইয়া, তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগেন্দ্র সূর্য্যকে দেখিয়া তাঁহার প্রেতাত্মা বলিয়া স্থির করিলেন এবং বিকম্পিতচিত্তে তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়িয়া গেলেন। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে নাকে মুখে কাঁদাইয়া তবে আত্ম-পরিচয় দিলেন। অনেকদিনের পর স্বামী-ভার্য্যায় পুনর্ম্মিলন হইল। সমস্ত গৃহে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল। সূর্য্যমুখীর সতীত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হইল না। শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "দেখলে নগেন! আমার কথা সত্য হইল কি না?—পাশকরা ভার্য্যা পাইলে কি না?"

(যে সকল লেখক স্বকীয় কল্পনা হইতে, যে সকল নায়ক-নায়িকার জন্ম দেন, অন্যান্য কবিদের কল্পনামতে, সেই সকল লেখক, সেই সকল নায়ক-নায়িকাদের জন্মদাতা বা পিতা। আমাদের নভেল ঠাকুরের বংশাবলীতে শৈবলিনী, পদ্মাবতী, শান্তি, ইন্দিরা প্রভৃতি

কল্যাণী, সূর্য্যমুখী, হীরা, ইত্যাদি ইঁহারা 'পাশকরা-কন্যা'।—আজ নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে মহোৎসব, সুতরাং ঐ সকল পাশকরা কন্যারা কুটুম্ব-স্বরূপে সূর্য্যমুখীর দর্শনে আসিয়াছেন। এই মহা মহিলা-সভায়, পাশকরা কন্যাদের মান্য অতিশয় অধিক। তাঁহারা আসন পাতিয়া সভার মধ্যস্থলে বসিলেন। এবং যাঁহার যে পর্য্যটন বৃত্তান্ত লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন।—কতস্থলে কত পুরুষকে কি ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া, কি কি কৌশলে তাহার নিকট হইতে পাশ বাহির করিয়া লইয়াছেন, সে সকল কথা সালঙ্কার বিবর্ণিত হইতে লাগিল। পাশবিহীনা নারীদল, পণ্ডিতদল মধ্যে মূর্খ রমণীবৎ অবাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পর্য্যটন কাহিনী শুনিতে লাগিল, এবং মনে মনে আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতে লাগিল—'এমন পোড়ারমুখীও জন্মিয়াছিলাম, জন্মটা বিফল করিলাম, একটা ছোট-খাট পাশ করিতেও পারিলাম না, বিবেচনা করি এইজন্যই, বঙ্কিমপড়া মেয়েরা পাশের দিকে আস্থামতি হইয়াছে।

(লেখকদের জ্ঞান-গুণ, চিত্ত-চরিত্র, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারাদি সমুদায়ই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে প্রকটিত থাকে; এবং পাঠকদের মধ্যে অনুশীলন শক্তি যাঁর যতদূর প্রবল, তিনি ততদূর তাহার অনুশীলন করিতে পারেন। যিনি কখনও যাহা দেখেন নাই—শোনেন নাই, তিনি সে কথার কল্পনা করিতে পারেন না। এবং যিনি অনেক দেখিয়াছেন, তিনি দশটা অজানা কথারও কল্পনা করিতে সক্ষম। কাজেই নভেল-ঠাকুরের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে এই বুঝিতেছি যে, 'হিন্দু-জগতে লম্পটেরা দেবতা এবং লম্পটীরা দেবী।' আমরা বঙ্গবাসী, হিন্দু-জগৎ যে কেমন, তাহা আমাদের চোখে দেখা বলিয়া আমরা ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আবার যখন অনেকানেক হিন্দুর মুখে ঠাকুরের প্রশংসা শুনি, তখন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি, ভাবিতে থাকি—'তবে কি হিন্দুরা সত্যসত্যই বেশ্যা-বিলাস-জাতি!' আবার ভাবি—'না না, মূর্খেরাই ঠাকুরের দমবাজীতে ভুলিয়াছে।—জ্ঞানী মাত্রই ঠাকুরের নিন্দা করেন।—যে সত্য কথা এইবার প্রকাশ পাইবে!)

পাশের গুণে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে ভুলাইলেন। নগেন্দ্র তাঁহাকে কুলে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সতীত্ব সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিল না। কারণ তিনি সপাশগৃহে প্রবেশ করিয়া, যে ভাবে আকাশস্পর্শী ভালবাসা দেখাইয়া নগেন্দ্রকে মন্ত্রমুগ্ধ করিলেন, সেরূপ ভালবাসা, পাশকরা নারীরাই দেখাইতে পারে। তিনি যদি সত্যসত্যই নগেন্দ্রকে ঐরূপ ভালবাসিতেন, তবে ঘর ছাড়িয়া পলাইতেন কি? সূর্য্যমুখীর বক্তৃতায় আমরা অবাক্, হিন্দুভায়ারা নির্ব্বাক্!

১০ ❋ কুন্দ কেন বিষ খায় ? ❋ ১০

ঠাকুর বলিতেছেন—"রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন নগেন্দ্রবাবু বাটী আসিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাতুর ও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক এবং বাহ্যিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় এবং ভীষণ ভাবাপন্ন হইয়াছিল। তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছিলেন। তিনি এই মানসে গৃহে আসিয়াছিলেন যে, তিনি সূর্য্যমুখীর শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তাঁহার এইরূপ শোকাবহ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শত্রুরাও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। (কুন্দনন্দিনী যে, তাঁহার অবস্থা দেখেন নাই, এমন কথা হইতেই পারে না। যখন বাড়ী পৌঁছিতে রাত দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছিল তখন নগেন্দ্রনাথের শয়ন করিতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়া থাকিবে।—যাহা হউক, তাঁহার সেই শোচনীয় অবস্থায়, সেই নিশাবশিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে, নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, পারাও একান্ত অসম্ভব।—কুন্দনন্দিনী সেই অভিমানে, এমন উদ্বিগ্নচিত্তা ও বুদ্ধিবিলুপ্তা হইয়া পড়িলেন যে, সে সেই বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, আপন গলায় আপনি বিষ ঢালিয়া দিলেন।—এমন না হইলে কি সম্রাটী কল্পনা! আর আমরাই কি সাধারণ হনুমান, মুখ পুড়িলেও আমাদের আক্কেল খুলিবার নহে। আমরা যেন ঠাকুরের পোষা বানর, ঠাকুরের ছড়ি দেখিয়া লঙ্কা ডিঙ্গাইতেছি।)

কুন্দনন্দিনী যে কেন বিষ খাইয়া মরিল, আমরা তাহার কারণ ঠাকুরের জটিল কল্পনা মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। ঠাকুর বলিতেছেন—"নগেন্দ্রনাথের বাটী আসিবার পূর্ব্ব হইতেই, কুন্দনন্দিনী স্বীয় মৃত্যু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তবে, মরণটা স্বামীর-আসা-পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মরিবার ইচ্ছা জন্মিবার কারণ এই হইয়াছিল যে,—তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নগেন্দ্রনাথকে বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে। তিনি ইতঃপূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথকে সে কথা বলিয়াছিলেন। "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়! অর্থাৎ কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে!"—সূর্য্যমুখী তো ফিরিয়া আসিয়াছিল, নগেন্দ্রের তো দুঃখ কাটিয়াছিল; তবে কুন্দনন্দিনী বিষ খাইল কেন? পাঠক, ঠাকুরের খেলা বুঝিলেন কি?—ঠাকুরের কল্পনা যে কখন কি বলে, তাহার অন্ত পাওয়া ভার।—বলুন দেখি পাঠক, কুন্দনন্দিনী তবে, কি কারণে, কি বুঝিয়া, নিজকে কি অপরাধে অপরাধিনী করিয়া বিষ পান করিলেন?

তবে শুনুন!—নগেন্দ্রনাথের অনুপস্থিত থাকায়, কুন্দনন্দিনী সে সময়ে দেওয়ান-

জিকে লইয়া একত্র বসিয়া লুকাইয়া সন্দেশ খাইতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, নগেন্দ্র বাড়ীতে আসিলেই তাঁহার এই চুরিটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাই তিনি, স্বামী গৃহে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিষপানে আত্মহত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাছে কুন্দ বিষ খাইতে ইতঃস্তত করে, তাই ঠাকুর তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন।—(স্বপ্ন, চোরা মেয়ে, সন্ন্যাসী, মেঘ-ঝড়, জলনিমজ্জন, পলায়ন, তন্ত্র মন্ত্র! ঠাকুর এই সাত কল্পনার জোরেই সম্রাট। ইহাই তাঁহার পুঁজি ও মূল সম্বল।) "যখন হীরা বিষকৌটা কুন্দকে দেখাইতেছিল, সেই সময়ে, নগেন্দ্রের কক্ষে মঙ্গল-জনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। এবং তদ্দ্বারা সূর্য্যমুখীর আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত হইল। হীরা বিষকৌটা কুন্দের নিকট ফেলিয়া সূর্য্যমুখীকে দেখিতে দৌড়িল।"—কুন্দ গেলেন না কেন?)

সূর্য্যমুখীর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া কুন্দনন্দিনীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। এই সূর্য্যমুখী কুন্দকে কুলটা বলিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই সূর্য্যমুখী এমন সুচতুরা যে, দেবেন্দ্র সন্ন্যাসীর ভাণে আসিয়াও, তাঁহার চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। সেই সূর্য্য আবার আসিয়াছেন।—দুই চারিদিনের মধ্যে যে তিনি কুন্দের গলা টিপিয়া চোরা সন্দেশ বাহির করিয়া, বামাল ও চোর ধরাইয়া দিবে তাহার বিচিত্র কি?—এই হেতু কুন্দনন্দিনী, মরণটা যত তৎপর হয় ততই মঙ্গল বিবেচনা করিলেন। বিষকৌটা অপেক্ষা গলাটা আরও নিকটে ছিল; যেমন বিষ হাতে করিলেন, অমনি তাহা গলায় ঢালিয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই, সর্ব্বজন-সম্মুখে, তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। (সতীন এবং স্বামী কুন্দের জন্য যতই মৌখিক মমতা-মায়া দেখান, তাঁহার জন্য বাড়ীতে ভীষক আসে নাই।—আমরা ঠাকুরের অগ্নিকুণ্ডের অন্ধ পতঙ্গ তাই এইরূপে পুড়িয়া মরিতেছি।—ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ বলিতেছি।)

আবার ঠাকুরের কথা শুনুন!—কুন্দনন্দিনীকে বিষ দিয়া হীরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহাকে পাওয়া গেল না।—হীরাকে দেবেন্দ্রবাবু দশ দিনে ত্যাগ করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তবে সে, কুন্দকে মারিয়া লাভবান্ হইল কিসে? ঠাকুর হীরাকে কুন্দের প্রাণহন্ত্রী বলেন কেন? (আর কেন বলেন—নৈলে যে, ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ বলিয়া দেখান যায় না। হীরা স্বামী ছাড়িয়া পলাইল কেন?—পলাইবে না, তবে কি সে, ইক্ষুরস পান করিবে নাকি?—ঠাকুর সমস্ত গ্রন্থটাকে হিজি-বিজি কল্পনায় পরিপূর্ণ করিয়াও কোন একটি কথাতেও সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই।—ঠাকুর যেন গ্রাম্য বুড়া ঠাকুরদাদা

সাজিয়া, গ্রামস্থবাদী পৌত্রদল মধ্যে সং দিয়াছেন। স্নান করিতে জলের ঘাটে আসিতেছেন, চ্যাংড়ার দল তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে তিনি বলিতেছেন। 'আমাকে কেহ বোনাই বলিও না, এখনি গলায় দড়ি দিব, এখনি জলে ডুবিয়া মরিব।' বলিয়া যতই মরিবার ভাণ দেখাইতেছেন, চ্যাংড়ারা ততই 'বোনাই বোনাই' বলিয়া চীৎকার করিতেছে।)

১১ * ঠাকুরের উপদেশ। * ১১

ঠাকুর বিষবৃক্ষ শেষ করিবার সময় বলিয়াছেন।—**"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম, আশা করি এতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"**

(বিষবৃক্ষের পাঠে, কি উপদেশ পাইলাম? কি করিলে আমাদের গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে? তাহা কেহ অবগত হইলেন কি?—ঠাকুরের ব্রীড়া-বিজড়িত বিকীর্ণ নয়নের যাদুকরী বার্ত্তাব্যূহ, যদি জনসাধারণে বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে আজ আমাদের এমন দশা হইবে কেন?—আমরা বঙ্গদেশের চ্যাংড়ার দল, যদি 'বোনাই' শব্দের অর্থই বুঝিব, তবে কি ঠাকুরের কাঁচা ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াই। 'গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।'—আমরা বুঝিয়াছি 'ঠাকুর আমাদের মতিচুর খাইতে দিবেন।'—একটা গভীর বুদ্ধির চ্যাংড়া বলিল। "আমি বুঝিয়াছি—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনিয়া যদি আমরা বিধবাদের বিবাহ দিই, তাহা হইলে, আমাদের ঘরে ঘরে বিষবৃক্ষ ফলিবে।—যদি সে বিধবা বড় লোকের মেয়ে হয়, তবে সে পুর্ণভুয়া হইয়া বিষ খাইয়া মরিবে। আর যদি সে হীরার মত দরিদ্রা কন্যা হয়, তবে পাগলিনী হইবে।—আর যদি আমরা বিধবাদের বিবাহ না দিই, তবে আমাদের ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে?"

অন্য চ্যাংড়া বলিল।"বিবাহ না দিলে বিষবৃক্ষ না জন্মিতে পারে। কিন্তু অমৃত ফলিবে কিসে?" আর এক চ্যাংড়া রাগ করিয়া বলিল।—"তোর যেমন আক্কেল! বিধবারা সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, এক প্রকার তপস্বিনীর ভাবেই কাল কাটায়। সেই পুণ্যের ফলে তাঁরা তাঁদের সাত পুরুষকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।"

প্রতিবাদী বলিল। কোথায় কয়টা বিধবা তপস্বিনী হয়েছে?—আমি তো

বাদী। তুমি যা'দের কথা বলচ, তারা সধবাতেও স্বেচ্ছাচারিণী। সুধী-সাধ্বী বিধবারা, অতীত পতির ধ্যানেই মগ্না হইয়া থাকেন। স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করিয়া নর-নেত্রের অগোচরে তপ-জপে নিশা পোহায়। তাঁদের চিত্ত ঈশ্বরময় ও দেবতা-দেবীদের মনোতুষ্টিকর হইয়া দাঁড়ায়। দেবতারা তাঁহাকে দেখা দেন ও তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর কুশল শোনাইয়া যান।—বিশ্বাস কর না কর, ইহা আমার চোখে দেখা কথা।

প্রতিবাদী। বিধবাদিগকে ঐরূপ তপ-জপে নিমগ্না রাখিয়া, আমাদের লোক সংখ্যা যে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, সমগ্র দেশখানা যে মরুভূমি হইয়া চলিয়াছে। আর কতদিনে এই জাতি এককালে বিলুপ্ত হইবে, সে চিন্তা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি করেন কি?

বাদী। চিন্তা কর্‌ছে বৈকি, সমাজ যে তেমন নয়। ঐ বিধবা তপস্বিনীরা তপের বলে যে সকল সন্তান উৎপাদন করে, সমাজ যদি তাদের গ্রহণ করিত তবে কি লোক সংখ্যা কমিত। সমাজের দোষেই আমাদের লোকবল কমিতেছে।

চ্যাংড়াদের কথায় কাণ দিতে নাই। তবে কিনা অমৃতটা যে কিসে ফলিবে আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।—চ্যাংড়াদের কথাতেও বিশ্বাস হইল না। যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝিয়া থাকেন, আর আমাদের বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিব। আমাদের নিবেদন, যেন সকলের স্মরণ থাকে। আমরাও গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম, আশা করি, ইক্ষুকে বিষবৃক্ষ আর কেহই বলিবেন না। আশা করি, বর্ব্বুর ক্ষেত্রচয় যেন ইক্ষুক্ষেত্রে প্রোন্নীত হয়।

পাছে হিন্দু-সম্প্রদায়ের কোন উপকার হয়, বুদ্ধি ও লোক সংখ্যা বাড়ে, দেশ হিতৈষণায় জ্ঞান জন্মায়, সেই মারাত্মক ভয়ে, বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের পুস্তকবিভাগীয় জ্ঞানী ম্যানেজার মহাশয় আমাদের এই পুস্তক (বঙ্কিম সমালোচনা) বিক্রয় করিবেন না। এই প্রতিহিংসায় পূর্ণ কলেবর জাতির সহিত মুসলমানদের একতা হইবে, কথাটা যার-পর-নাই বিশ্বাসযোগ্য।

সম্পূর্ণ

বঙ্কিম সমালোচনা।

কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিধবা-বিবাহ।

(স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা-বিবাহ' উপলক্ষ্যে আমাদের নভেল্ঠাকুর দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন—বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল।—বিষবৃক্ষে তিনি বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন। অলীকভাবী সাক্ষীরা যেমন সত্যকথা অন্তরমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, আদালতে মিথ্যা এজ্‌হার দিয়া, স্বপক্ষীয় লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া যশঃলাভ করে; ঠাকুর বিষবৃক্ষ গ্রন্থে অবিকল তাহাই করিয়াছেন। তারপর, অলীক সাক্ষীরা যেমন, জেরার সময়ে স্বীয় চিত্তের উপর আধিপত্য রাখিতে না পারিয়া, এক প্রকার অজ্ঞাতসারে সত্যকথাগুলি বলিয়া ফেলে, ঠাকুরও সেইভাবে কৃষ্ণকান্তের উইলে সত্য কথাগুলি চাপিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন।

এই দুইখানি গ্রন্থ, রাজবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া পাঠ করিলে, ঠাকুরের মনের সকল কথাই অনুশীলন করা যায়। তিনি যে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না; তবে যে তিনি এজ্‌হারের সময়ে (অর্থাৎ বিষবৃক্ষ গ্রন্থে বিপক্ষতা করিলেন কেন? তাহার কারণ আছে—দেশের যাবতীয় গোলাম-জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তাঁহার পুস্তকের উপাসক এবং তাহারাই বিধবা-বিবাহের বিপক্ষতা করিয়াছিল; সে ক্ষেত্রে ঠাকুর তাঁহার উপাসকবৃন্দের মন রাখিবার মানসে এজ্‌হার বা জবানবন্দীতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতিপয় কাঁচা মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সে গ্রন্থের অনুবীক্ষণে দেখাইয়া দিয়াছি। জেরার সময়ে (অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তের উইল লিখিবার সময়ে) সেই সত্যগুলি তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত করাইবার জন্য, বিবেক তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিল। তখন তিনি সেই সত্যকথাগুলি এমনভাবে প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার হীনবুদ্ধি উপাসকবৃন্দ কিছুতেই তাঁহার সেই কৌশল-সম্পন্ন জেরার ভাবে প্রবেশ করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে জ্ঞানিগণ সহজেই বুঝিয়া লইলেন যে, তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। পাঠক মহাশয় দেখিবেন, আর্‌গুমেণ্ট শুনিয়া বিচারপতি মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই জয়ী করিবেন। পুস্তকের শেষভাগে সেই আর্‌গুমেণ্ট ও জজ্‌মেণ্ট প্রকাশ পাইবে।)

হোসেনী-ছন্দ।

(কেবল যতিচিহ্ন সকলের স্থলে অর্দ্ধ সেকেণ্ড মাত্র বিরাম দিয়া পাঠ করিলে, এই মধুময় ছন্দ, যতই দ্রুতবেগে পাঠ করুন না কেন, ইহা কোন স্থলেই বাধিবে না, বরং কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে থাকিবে।)

ধ্রুবসত্যের স্প্রিংশক্তি।

যেমনি কৌশলী তুমি বীরবক্তা হও, ফন্দীবাজী দাগাবাজী, হের-ফেরে শক্তিশালী, উৎকোচে ওস্তাদ ; বচনবিন্যাসে আর মহাকায় কবি ; তথাপি তথাপি তুমি, ধ্রুব সত্য যাহা তাহা নারিবে লুকাতে।—সে চেষ্টা করিবে সেই দাসবুদ্ধি যেই, পরম অশিষ্টাচার দুষ্টের প্রধান, দারুণ অদূরদর্শী। চাপিয়া অন্তরতলে ধ্রুব সত্যচয়, ধ্রুব মিথ্যা দিয়া যাঁরা সাজান পুস্তক, বিরচি' অলীক-মালা; বিদ্যা নহে হীনজ্ঞান বিতরেণ তিনি, ডুবান স্বদেশ ভূমি ভীষণ প্লাবনে। সে সকল গ্রন্থকার পড়িলে জেরায়, জ্যোতিভ্রষ্ট হয় তাঁর দুষ্ট বাক্যলীলা। সেরূপ গ্রন্থের পাঠে ক্রমশঃ অলীকভাষী হয় দেশবাসী, হীনজ্ঞানে অত্যাচারী, দেশের দুর্গতি যত করে আনয়ন।

পড়িয়া এ বঙ্গদেশ, এইরূপ দুষ্যকল্পী কবির কবলে, হইতেছে ছারখার ; বুদ্ধির অভাবে আর, সংশোধন কভু তার নহে হইবার। অর্থ অর্জ্জনের ইহা দুষ্ট ফন্দী বিনা, বিদ্যা বিতরণ এতে কি আছে কোথায় ? গোলাম জ্ঞানের-চর্চ্চা চলে যেই দেশে, সেই দেশ বিনা, হেন পুস্তকের আছে সম্মান কোথায় ?

পোড়াবাস নাসিকায় না পশে যাহার, আর দুর্গন্ধ বাসির; সে হেন অজ্ঞের কাছে, পারিবে বেচিতে তুমি বচন বিন্যাসে, পোড়া রুটিগুলি তব বাসি সপ্তাহের।—সতেজ নাসিকা যার, তার আগে এ চালাকি নহে চলিবার। তোমারই সে রুটিগুলি, দিবে সাক্ষ্য ধৃষ্টতার প্রাণের তোমার!—বলিছেন শেখসাদী—"বাসরা গোলাপ বলি' কেন কিরে কর, গোলাপ আপনি সাক্ষ্য দিবে আপনার।"

ধ্রুব সত্য লুকাইবে, সেই শক্তি সৃষ্টিতলে কেহ না পাইল। ধ্রুব সত্য যাহা, চাপিবে যতই তারে উঠিবে ঠেলিয়া, নারিবে রোধিতে গতি।—দিবানিশি শিক্ষা করি' যবে আদালতে, দাঁড়ায় এজ্‌হারে সাক্ষী বলিতে অলীক, অবাধে অলীক বলি' লভে

সে সুবর্ণঃ। কিন্তু অন্য দিন যবে পড়ে সে জেরায়; তখন কেমন ভাবে, লুকাইত সত্যগুলি, আপনি ঠেলিয়া যেন স্প্রীঙের বলে, উঠে তার সেই মুখে, দেয় ধরাইয়া তারে ধৃষ্টতা যতেক। সেই ধ্রুব সত্য হতে ধ্রুব মিথ্যাগুলি, যেজন বাছিয়া নারে করিতে পৃথক, দাসবুদ্ধি ব্যক্তি সেই; আর যে বাছিতে পারে রাজবুদ্ধি সেই।

স্প্রীঙের সত্যশক্তি চাপিবার তরে, যে জন সে গদি পরে করিয়া শয়ন, লুকায় সে শক্তি তার; না জানে সে মূর্খ মূঢ়, স্প্রীং তাহারে, নাচাইবে অবিরত প্রতি পার্শ্ব-ত্যাগে। রাজজ্ঞানগত জন সে নাচনে তার, স্প্রীঙের গদি বলি স্থিরেন অন্তরে; কিন্তু দাসবুদ্ধিগণ না পারে ভাবিতে, স্প্রীং সে শয্যাতলে আছে কি না আছে।— যে মাথা স্প্রীংহীন হেলে না দোলে না, সে মাথা বুঝিবে কবে শক্তি স্প্রীঙের?

গ্রন্থ লিখিবার কালে, সত্যকে লুকায় যিনি বচনের চাপে; তখন সে ধ্রুব সত্য, তলদেশ হতে ঠেলি নাচায় তাঁহারে। দাসবুদ্ধি যারা, নাচনের হেতু তারা না পারে নির্ণিতে।—বিষবৃক্ষ প্রণয়নে কবি আমাদের, সত্যকে চাপিয়া ধরি, যাহা কিছু বলিলেন এজহারে তাঁহার। দাসবুদ্ধি ব্যক্তি যত, ধ্রুব সত্য বলি তাহা করিলা গ্রহণ। সেদিকে সত্যকে যবে চাপিলেন কবি, বিবিধ অলীক বাক্যে, সত্য তাঁরে অবিরত লাগিল নাচাতে। সে মহা জেরায় পড়ি বিপত্তি হেরিয়া, লিখিলেন তিনি কৃষ্ণকান্তের উইল, লইলা সত্যের পক্ষ রোহিণী মার্ফতে। কিন্তু এই সত্য ব্যাখ্যা হইল সেরূপ, যেরূপ পীড়নে পড়ি বীর উকিলের, মিথ্যাসাক্ষী বলে সত্য জেরার সময়। পরন্তু আমরা লইনু এজহার জেরা কবি প্রবরের; আর্গুমেণ্ট হবে যবে পুস্তকের শেষে, সে অনুবীক্ষণে চক্ষু খুলিবে সবার, বিদ্যাসাগরের জয় দেখিবে তখন।

১ ✻ সুন্দর সহোদর। ✻ ১

স্নেহ মমতায় গাঁথা, দুইটি কুসুম যথা এক বৃন্তপরে, আছিলা হরিদ্রা গ্রামে দুই সহোদর; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত রায়, রামকান্ত রায় নাম ছিল কনিষ্ঠের। অদ্বৈত বিচারপতি, ধর্ম্মপরায়ণ অতি দেবতা-স্বভাব। যুগল সে সহোদর এক প্রাণে মিলি, অর্জ্জিলা অনেক ধন ভূতলে অতুল, কত জমিদারী কত সম্পত্তি সোনার। প্রত্যক্ষ আধিক্য নহে, দুই লক্ষ টাকা, বার্ষিক আদায় যার বলেন সম্রাট।

অকালে কালের গ্রাসে, সহোদর রামকান্ত পড়িলা তাঁহার, গেলা চলি স্বর্গপুরে; রত্নবৎ এক পুত্র, গোবিন্দলালেরে তিনি রাখিয়া সংসারে। সম্পত্তি সকলই ছিল

বেনামে জ্যেষ্ঠের, ধর্ম্মপরায়ণ তিনি স্বভাবে সুন্দর। তাঁহার সংসারে ছিল তিনটি সন্তান, হরলাল শৈলবতী আর বিনোদিনী। হরলাল ছিল দুষ্ট জ্যেষ্ঠ সবাকার, ভার্য্যাহীন গৃহশূন্য; অবিরত উড়াইয়া বেড়াইত ধন; বিচরিত চরাচরে; অবচরি কুটকুশী নিন্দিত আচার। চক্ষুশূল হেন জন ছিল সকলের।

ছিলেন ধার্ম্মিক অতি কৃষ্ণকান্ত রায়, রাখিতেন আত্মাতলে, হিন্দুর সদ্গুণ যত আচার বিচার। এ কালের লোক প্রায়, মৃত-কনিষ্ঠের প্রতি, অনিষ্ট করিতে মন না চাহিল তাঁর। (দেখুন পাঠক এবে নভেল ঠাকুর, আঁকিছেন কি ধরণে চরিত্র হিন্দুর। জেরার অঙ্কন ইহা, কোন গ্রন্থে হেন ছবি না আঁকিলা কবি।—এই দুই সহোদরে আঁকিলা যেভাবে। আঁকিতেন যদি তিনি, হিন্দু-মুসলমানরূপ সহোদরদ্বয়ে, ধরিয়া এ স্বরভি তুলী; তবে কি এ বিষবৃক্ষে, ফলিত না স্বর্ণফল একতাবৰ্দ্ধক?—তা' হলে কি হয় বঙ্গ এভাবে কাঙ্গাল; এরূপ উন্মার্গগামী, এত অহঙ্কারী এত ধৃষ্ট অত্যাচারী! উন্নত গোলাম জ্ঞানে রাজবুদ্ধিহীন!)

সম্পত্তি সকল পরে, করিলেন উইল এক কৃষ্ণকান্ত রায়। ভাই ভগ্নী নাই তাই, গোবিন্দলালেরে দান করিলা অর্দ্ধেক; অবশিষ্ট অষ্ট আনা, বণ্টন করিলা তিনি আত্মজে আপন। জ্যেষ্ঠ হরলাল তায়, পায় তিন আনা অংশ যথাসর্ব্বস্বের; বাকি পাঁচ আনা, দিলেন বাঁটিয়া নিজ পত্নী কন্যাদের।—হিংসার সম্রাট হয় ক্রুর ভয়ঙ্কর, গোবিন্দের ভাগ্য হেরি, জ্বলি রোষানলে, নিবেদিল পিতৃপদে ঘোর প্রতিবাদে। সে হিংসার প্রতিকার করিতে জনক, ছিঁড়িয়া সে উইলপত্র, গড়িলা নূতন এক নূতন ধরণে। রহিল প্রকাশ তায়, হরলাল এক পাই পাবে সম্পত্তির। অর্দ্ধেকের অবশিষ্ট, শৈলবতী বিনোদিনী পাইবে উভয়ে। এরূপ করিতে পিতা, অমনি কুপিত পুত্র পিতার উপর, এক মহা ষড়যন্ত্র বীর জালিয়াতী, বিরল গোপনে হানি করিতে প্রস্তুত। (যেই পাপ ষড়যন্ত্র, ঢুকায়েছে বঙ্গদেশে দুষ্ট জগৎশেঠ, করিয়াছে এ দেশ নষ্ট, সেই ষড়যন্ত্র এই; আবাসে আবাসে এবে করিয়া প্রবেশ, খণ্ড রাজ্য এ দেশের ধ্বংসিছে সদাই।—কি বলিছে দুষ্ট শেঠ, যমজ-ভগিনী কাব্যে দেখ তা পড়িয়া।—"বঙ্গের ভবিষ্য-দশা যতই ভীষণ, হইবে ততই হিন্দু হবে ফুল্ল মন।—যদি এই কার্য্য ভায়া পারি সমাধিতে, অভাগা নবাবে আনি পলাশী-প্রাঙ্গণে, দেখিবে তখন, এদেশের দশা হয় কেমন ভীষণ। * * প্রতি গৃহ বাঙ্গালার, প্রত্যেক প্রাঙ্গণ, হইবে পলাশী ক্ষেত্র; এই ষড়যন্ত্র আদি কুমন্ত্রণা যত, আচার ব্যভার-রূপে বঙ্গে বিচরিবে।"

দুষ্ট কৃষ্ণদাস প্রায় ব্রাহ্মানন্দ নামে, এ কৃষ্ণকান্তের ছিল সরকার একৈক, সেই

লিখেছিল এই সুচারু উইল। ধনে বশীভূত করি হরলাল তারে, অন্য এক জাল উইল লইল লেখায়ে। সে স্বেচ্ছার-উইলপত্রে, গোবিন্দলালের নামে রাখি এক পাই, নিজ ভাগে বার আনা লইল লেখায়ে; বাকি যা রহিল দিল ভাগে সকলের। এরূপে দলিল গড়ি, পিতার দেরাজে তাহা চাহিল রাখিতে, আর সে হরিতে মূল দলিল তাঁহতে। কিন্তু এ ভীষণ কাজ, করাইবে কারে দিয়া—পড়িল চিন্তায়।

২ ❋ প্রেম প্রত্যাশী বিধবা। ❋ ২

রোহিণী নামেতে এক বিধবা রূপসী, করিত পাড়ায় বাস, সুবাদে ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল সরকারের। সেই কন্যা নিরুপমা চতুরা বিষম, দূষিতা চরিত্র দোষে; তাহারেই নির্ব্বাচন করি হরলাল, চিন্তিলা আপন মনে—"এই যুবতারে, প্রেমের লালসা যদি দেখাই আমার, নিশ্চয় পড়িবে ফাঁদে, করিবে এ কাজ মোর বিরল গোপনে।' এই রূপ চিন্তি মনে, রোহিণী-সদনে তিনি করিলা গমন।

ছড়াইয়া পৃষ্ঠদেশে কাল কেশরাশি, রোহিণী রন্ধন কার্য্যে বসিছে চালায়। সে হেন সময়ে, হরলাল গিয়া তারে দিলা দরশন। সামলি বসন বামা হেরি সে পুরুষে, বসিলা বউটি হয়ে দেউটী সোনার, জিজ্ঞাসিলা হাসিমুখী,—"অনেক দিনের পর, কি মনে করিয়া এই শুভ আগমন!—শারিরীক মানসিক আছেন কেমন!' উত্তরিলা হরলাল আপন কৌশলে। "আমার দুখের কথা নাহি কি শুনিলে?—পত্নীরে লুটিল যম, পিতা লুটিলেন মম ভাগ্যের ভাণ্ডার, কি সুখ রহিল তবে এ বিশ্বে আমার! কে আছে আমার বল, এ চোখের বারিরাশি দেখাব কাহারে?—কেহ না শুধায় যবে, কি কাল হইয়া অন্ধ বিরল রোদনে? তাই ভাবিয়াছি শেষ—পরবাসে গিয়া বাস করিব কোথাও, মনেরে সান্ত্বনা দিতে পারিব তাহাতে!—কে আছে আমার আর—কার কাছে গিয়া চাব বিদায়ী চুম্বন, কারে বা জানাব কহ বেদনা মনের।—একমাত্র তুমি, দু'কথা হাসিয়া কও আমার সহিত; তোমা বিনা তাই, যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি অন্ধকার।—তোমারি নিকট, আসিয়াছি তাই আমি লইতে বিদায়।"

গলিয়া চলিয়া মনে মরমে হাসিয়া, দেখাইয়া মায়ারাশি, রোহিণী-উল্লাসে ভাসি, কহিলা তাঁহারে। "কেন তুমি অকারণে যাবে কোন দেশে! তুমিই বাড়ীর কর্ত্তা জ্যেষ্ঠ সবাকার; জ্ঞান-গুণে শ্রেষ্ঠ জন। হউক এ বাড়ীছাড়া বালাই তোমার, তুমি তবে-কোন দুখে!—উইলে লিখিল ব'লে, সম্পত্তি হইতে তুমি হইবে বঞ্চিত?

মগের মুল্লুক নাকি!—কভু না হইবে আমি পারি তা' বলিতে।—আর এক কথা বলি, থাকিও না গৃহশূন্য! বিবাহ করিলে, সব মনোদুখ দূর হইবে তোমার। গৃহলক্ষ্মী না থাকিলে, লক্ষ্মীছাড়া বলি তারে আপনি দেখায়।"

কহিল সজল চোখে চাহি' হরলাল। "তোমা হেন জায়া যদি পাইতাম আমি, রূপে-গুণে প্রাণভরা চটুলা চতুরা; এ বিপত্তিকালে, কখনই কোন চিন্তা নাহি করিতাম, কৌশলে সম্পত্তি যত করিতাম হাত।—পাঁচনি বিহনে, রাখালের বল-বুদ্ধি কিছু কি খেলায়?" শুনি এ মধুরবাণী, রোহিণীর মনোবীণা উঠিল বাজিয়া, ধরিল মধুর গান। আনন্দে ভরিল প্রাণ ভুলিলা স্বকাজ। পুড়িতে লাগিল সংস্থ চুলার উপরে। তাড়াতাড়ি হাঁড়ীখানা নামায়ে ভূতলে, কহিলা মধুর হাসি। —"হউক্ যেমনই কাজ! আমা' হ'তে হওয়া যাহা হইবে সম্ভব, করিব নিশ্চয় তব হব হিতৈষিণী।—সোনার সংসার ছেড়ে কোথা যাবে তুমি?"

কহিলেন হরলাল প্রফুল্ল বদনে। "পারি তব হিতৈষণা করিতে গ্রহণ, প্রতি-দান তার, যা' চাও খুলিয়া যদি বল তা' আমায়। কহিলা সুন্দরী শুনি।—"প্রতিদান নিব,!—এমনি কি নীচমনা ভাবিলা আমায়? বিনা প্রতিদানে, জীবন এ রোহিণীর দেখ না চাহিয়া, দেয় কি না দেয় তোমা!"

কহিলেন হরলাল স্বীয় স্বার্থ হেতু। "এ কাজ স্বতন্ত্র অতি—প্রতিদান না লইলে, এ কাজ বিশ্বাস করি না পারি বলিতে।" কহিলা রোহিণী এবে চিন্তি, কতক্ষণ। "যা' দিবার দিও তুমি, করিব গ্রহণ—বল কি করিতে হবে!"

কহিলা বিকীর্ণ চোখে চাহি' হরলাল। "তোমার এ পরিশ্রমে, লভিব যে ফল দু'জনে মিলিয়া ভোগ চাহি' তা' করিতে—এতে না স্বীকার কর না বলিব আমি, না লইব কোনরূপ সাহায্য তোমার, যাইব ছাড়িয়া দেশ।"

মনের মানস তাঁর বুঝিয়া রোহিণী, কহিলা আনন্দে ভাসি'। "কেমনে পারিব তাহা, কোন বিধি মতে।" কহিলা হাসিয়া হর—"স্বয়ং ঈশ্বর তিনি, চন্দ্র সাগরের যোগে, বিদ্যা বলে যে বিধান দিয়াছেন দেশে, সে বিধান ধরি, বিধবা-বিবাহ এবে চলেছে চৌদিকে।—সে চিন্তা কি হেতু তবে করিছ সুন্দরী। আর যদি সে বিধান না কর গ্রহণ, বল তা' খুলিয়া তবে; না করিব আমি তায়, আমার এ মনকথা কিছুতে প্রকাশ।" এই বলি মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।

কহিলা রোহিণী—"খুলিয়া বলনা কেন কি কাজ তোমার, বলনু তো আমি যাহা আদেশিবে তাহা

কহিলেন হরলাল বুঝায়ে তাহারে,—"আছে এক মহাকাজ, সাধিতে পারিলে রাজা হইব দেশের। তোমারে করিয়া রাণী, দু'জনে মিলিয়া ভোগ করিব রাজ্যের।—বল তুমি রাজরাণী হবে কি না হবে?" নতশিরে উত্তরিলা রূপসী রোহিণী—"হইব তো বসিলাম, আর কি বলিব।"

এরূপে অলীক আশা দিয়া রোহিণীরে, সে জাল দলিলখানি, হাসিমুখে রূপসীরে করিয়া প্রদান, দিলা উপদেশ আর কানে বাথানিয়া। "পিতার দেরাজ তুমি জান বেশরূপে, সদা গিয়া থাক তথা; আর তার চাবি থাকে উপধান-তলে, জান তা উত্তম তুমি!—নিশার গভীরে গিয়া খুলি' সে দেরাজ, দেখিবে দলিল এক রয়েছে ভিতরে,—সেখানি লইবে তুলি' আর সেই স্থলে, রাখি' এ দলিল তুমি বাঁধি সে দেরাজ, যথাস্থলে চাবি রাখি আসিবে চলিয়া। রাজারাণী হইবার এই তো উপায়।"

দলিল লইয়া করে রোহিণী রূপসী, পড়িলা চিন্তার স্রোতে। (ওরে দুষ্ট হরলাল; ভাবিলি কি তুই, ফাঁকি দিয়া রোহিণীরে মারিবি এ পাখী।—জানিবি কি মূঢ় তুই! তো'রি মত জরি মোরা প্রতিহিংসা বিষে, সিরাজের সর্ব্বনাশ করিবার তরে, মিশেছিনু একদল বণিকের সাথে, রোহিণীর সাথে তুই মিশিলি যেমন। ঠকাইতে গিয়া মোরা ঠকিনু সেকালে, হারাইনু ভারতের সমস্ত দলিল। দেখিব এবার, তোর ভালে প্রতিফল ফলে কি প্রকার।)

৩ ❋ প্রেমের নেশায় চুরি। ❋ ৩

রাণী হইবার এবে লালসা প্রবল, রোহিণীরে অতিশয় করিল বিকলা, নিশার গভীরে বামা, পশিলা নীরবে কৃষ্ণকান্তের কুটীরে। শিয়র হইতে চাবি করিয়া গ্রহণ, খুলিলা দেরাজ তাঁর, লইলা দলিল মূল, রাখিলা তথায় জাল দলিল হাতের। এইরূপে সারি' কাজ, যথাস্থলে চাবিগুচ্ছ করিয়া অর্পণ, সুধীরে সেস্থল ত্যাগ করিলা রূপসী।

আনি' সে দলিলখানি রোহিণী সুন্দরী, রাখিলা গোপন করি'। নাহি দিলা হরলালে, (না দিলা যেমন, পাইয়া আপন করে ইংরেজ বণিক, বঙ্গের দলিলখানি আর আমাদের।—মুসলমান হ'তে রাজ্য কাড়িল কৌশলে, ভোগে না আসিল কিন্তু কোন কিন্নরের।)

হরলাল হাসিমুখে, রোহিণী-সমীপে আসি' চাহিলে দলিল; রোহিণী কহিল তায়। "তোমার লাগিয়া আমি সাজিলাম চোর, করিলাম কাজ যাহা কেহ না পারিবে,

তথাপি বিশ্বাসী তব নাহি কি হইনু?—আমার নিকট থাকা, থাকা তব ঠাঁই, নহে কি একই কথা?—তোমাতে আমাতে ভেদ দেখ কি আবার?—বিবাহের পর, সকল সম্পত্তি তোমা দিব ফিরাইয়া।

বঙ্গদ্রোহীদের মত, পড়িল সে হরলাল ফাঁফরে এবার। ফুটিবার কথা নয়, করিলা রোহিণী সহ গোপনে কোন্দল। অবশেষে ভাবিলেন—কার্য্য যাহা সিদ্ধ তাহা লয়েছি করিয়া, সময়ে সম্পত্তি ভোগ আমিই করিব, কি কাজ কোন্দল করি রোহিণীর সাথে। এই ভাবি সেই হতে, করিলা আলাপ ত্যাগ রোহিণীর সাথে। (তোরই মত দ্রোহী যত, না পেয়ে দলিল, মনেরে প্রবোধ দিল এরূপ কথায়।—"ইংরেজ পেয়েছে রাজ্য ক্ষতি নাই তায়, রাজসিংহাসন হ'তে, নেড়েদের গড়াইয়া দিছি তো ফেলিয়া।")

৪ ✱ শাখা হ'তে শাখান্তর। ✱ ৪

চিন্তিলা রোহিণী এবে অন্তরে আপন। 'যে মোরে করিবে রাণী, এ রাজ্য তাহারি করে করিব অর্পণ। যার ধন দিব তারে, সে জন আমারে সুখী কেন না করিবে? দেখিব এবার আমি, গোবিন্দলালেরে হাত না করি কেমন।'

নিয়ত গোবিন্দলাল সন্ধ্যা সমাগমে, আসিতেন বারুণীর কানন-ভ্রমণে, বসিতেন সরো-তীরে, করিতেন প্রাণতোষী সমীর সেবন। অবিকল সে সময়ে রোহিণী রূপসী, জল তুলিবার ভাণে, আসিতে লাগিল তথা, রচিতে সুন্দর প্রেম তাঁহার সহিত। লাগিলা দেখাতে তার, নানা রঙ্গভঙ্গি সহ হাসির বাহার, বচন-বিন্যাস কত রসাল ভাষার; কত অপরূপ ঠাট ঠমক সুন্দর, কতরূপে আর, বিকীর্ণ আঁখির ব্রীড়াবার্ত্তার নিকর। সেই রসালাপে মজি, অন্ধ পতঙ্গের মত ফাঁদে রোহিণীর, পড়িল গোবিন্দলাল। ধীরে ধীরে পাসরিতে লাগিলা ভ্রমরে।

ভ্রমরাবরণা ছিলা যুবতী ভ্রমর, গোবিন্দলালের ভার্য্যা, পরমসরলা সতী সাবিত্রী স্বভাবা; নিরুপমা গুণবতী, প্রাণভরা পতিভক্তি হৃদিভরা প্রেম। শ্যামলবরণী কন্যা কুরঙ্গীনয়না, গঠন পঠন যোগ্য প্রাণ মনোহর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা অতি চমৎকার। গুণ মহিমায় সতী পতিরে আপন, রেখেছেন মুগ্ধ করি, পাড়া প্রতিবাসী যত বিমুগ্ধ সকলে। মহানতি সে পতির মতিগতি যত, রোহিণী ফিরায়ে দিল, দেখাইয়া শ্বেত-শোভী বর্ণ শরীরের। মজিল গোবিন্দলাল, (মজিল যেমন, দ্রোহীদল এককালে

সাগর-বিলাসী তিনি রোহিণী রূপসী, দর্শন-শিশিরে সাধ নারি নিবারিতে, হইলা বিকলা অতি। চাতকিনী হেন বামা তৃষ্ণাতুরা অতি, গোবিন্দ-বারিদ পানে, লালাইত নেত্রপাতে থাকেন চাহিয়া। তথাপি তথাপি, সে চুম্বন আলিঙ্গন না ফলে কপালে। ব্রীড়াদেবী দাঁড়ায়েছে রচিয়া প্রাচীর, এ দুই প্রেমিক মাঝে। কোন পক্ষ হ'তে, নারিছে সরাতে সেই প্রাচীর প্রবল। রোহিণী কৌশল এক করি আবিষ্কার, একদা গোবিন্দপরে করি অভিমান, কহিলা মধুর রোষে। "কি হবে বহিয়া তবে বিদগ্ধ এ দেহ! এখনি বারুণী-নীরে, এ জীবন বিসর্জ্জন করিব আমার।" এই বলি ডুবিলেন সে স্মরঃ-সলিলে। দৌড়িয়া গোবিন্দলাল পশি সেই জলে; সোনার প্রতিমা প্রায়, তুলিলেন কোলে করি শব রোহিণীর। মালির আবাসে আনি, অধরে অধর রাখি দিলেন ফুৎকার। সেই আলিঙ্গন সহ পাইয়া চুম্বন, জীবন পাইলা বামা; বহিল নিশ্বাস তার সুধীর প্রশ্বাসে। এত করি সে সুন্দরী, তাড়াইলা উভয়ের ব্রীড়া ভয়ঙ্কর। গোবিন্দ ভাবিলা, "রোহিণী পুষ্পের মধু মরি কি মধুর।"

৫ ❋ প্রেমের ফাঁস। ❋ ৫

এতদিনে রোহিণীর; মনের সন্দেহ যত গেল নিবাইয়া, স্থিরিলা অন্তরতলে—'কিছুতে গোবিন্দলাল, হরলাল সম নহে বিশ্বাসঘাতক।' পরন্তু প্রকাশ করি, দলিলের গুপ্তকথা কহিলা তাঁহারে। গোবিন্দ গণিল তারে হিতৈষিণী বলি। (গণিল যেমন মিরজাফর বর্ব্বর, পাইল বিলাতী প্রেম যবে সে দুর্জ্জন।)

নিশার সাক্ষাৎ এবে, চলিতে লাগিল দোঁহা বিরল গোপনে। একদা রোহিণী, প্রবেশিলা পুনঃ কৃষ্ণকান্তের কুটীরে, হরিলা আবার চাবি খুলিলা দেরাজ, রাখিলা দলিল মূল হরি' জালখানি। সে হেন সময়ে, জাগিলেন কৃষ্ণকান্ত জ্বালিলেন আলো। হইয়া উপায়হীনা চতুরা তখন, সে জাল দলিলখানি দিল পোড়াইয়া, (অনল পাইলা কোথা জানেন ঠাকুর।) কঠিন বন্ধনে এবে, সে কোমল কর তাঁর পড়িল তখনি, অগত্যা সকল কথা কাঁদি নিবেদিলা, তথাপি তাহার প্রতি হইল আদেশ,—"মুড়াইয়া কেশ ঘোল ঢালিয়া মাথায়, গ্রাম হতে পাপিনীরে দেহ তাড়াইয়া।"

বিষম বিবন্ধে পড়ি রোহিণী সুন্দরী, কাটাইলা কাল নিশা। প্রভাতে জুটিল লোক চারিদিক হতে, জনে জনে লজ্জাদান করিলা তাহারে। গোবিন্দ শুনিয়া,

করিলেন তিনি ; কিন্তু গোবিন্দের প্রতি সন্দেহ করিয়া, করিলা আবার তিনি দলিল বাতিল ; লিখিলা নূতন এক। গোবিন্দের স্থলে, বসাইলা এ দলিলে নাম ভ্রমরের, গোবিন্দে সম্পত্তি হ'তে করিলা বঞ্চিত। (বিধবা যুবতী যত, কিরূপে ছড়ায় তারা বিষ তাহাদের, আর সেই বিষ, কিরূপে এদেশ নষ্ট করিছে চৌদিকে ; এ জেরায় কবি তাহা দেন দেখাইয়া, এমন সুন্দরভাবে ; আর্‌গুমেণ্ট শুনি যেন, বিবেক-বিচার-পতি প্রত্যেক ব্যক্তির, বিধবা-বিবাহ দেন চালাইয়া দেশে।

কিছুদিন পর যবে কৃষ্ণকান্ত রায়, গেলা চলি পরলোকে ; সে অর্দ্ধ সম্পত্তি ভ্রমর লিখিয়া দিলা স্বামীরে আপন। তথাপি গোবিন্দলাল বিনা অপরাধে, ভ্রমরের শত দোষ লাগিলা দেখিতে। (দেখিল জাফর যথা দোষ সিরাজের।—রাজবুদ্ধি থাকে যদি তোমাতে পাঠক, দেখিতে পাইবে তবে ; বিধবা সবার, অঙ্গের বাতাস হয় কত ভয়ঙ্কর। যে আবাসে পশে এই আবদ্ধ বাতাস, ভষ্মীভূত হয় তাহা। পুনর্ভূ উচিত কি না বিধবাদিগের, দিতেছেন চোখ চিরে দেখাইয়া কবি।)

৬ ✻ নিরুদ্দেশ। ✻ ৬

'কিচেকিচি ঝিকেঝিকি' না পারি সহিতে, গোবিন্দলালের মাতা, চাহিল কাশীতে গিয়া কাটাইতে কাল! গোবিন্দ লইয়া তাঁরে গেলেন তথায়। যাইবার কালে, রোহিণীরে উপদেশ দিলেন গোপনে, করিলা ভ্রমরসহ প্রকাশ্যে কোন্দল!— (বিধবা যুবতীগণ, কত অমঙ্গল আনি ধনীর আবাসে, করে ছারখার তাহা ; পড়িয়া এমন জেরা নারে যে বুঝিতে, দাসবুদ্ধি লোক সেই গোময় মস্তক।) কিছুদিন পর, রোহিণী তারকেশ্বর করিলা গমন। সেই মহা পুণ্যস্থলে, গোবিন্দ মিলিল আসি রোহিণীর সাথে, দু'জনে মিলিয়া চলি গেলা যশোহর। সেখানে যাইয়া, সুখের আবাস তাঁরা করিয়া নির্ম্মাণ, রহিলা পরমানন্দে। ভুলিলা ভ্রমরে এবে জনমের তরে।

ভ্রমর কাতরা অতি পতির চিন্তায়, স্বামী হেতু অবিরত ঝরান নয়ন ; অনাহারা অর্দ্ধাহারা, ছিন্ন কেশে স্নানাহার না করি সময়ে, ক্রমশঃ হইল শীর্ণা, জ্বরকাশ দিলা দেখা অভাগিনী তাঁরে, ফুরাইল এবে তাঁর আশা বাঁচিবার। (দেখে যাও আছ যত বঙ্গ বুদ্ধিবীর,—বিধবা-অনল গিয়া পড়ে যে বাড়ীতে, সে বাড়ী কিভাবে পুড়ি ভষ্মীভূত হয়।—এমন সুন্দর জেরা পড়ি ঠাকুরের, তথাপি যে জাতি, বিধবা সবার গতি

জনক তাঁহার, আইলা মাধবীনাথ, নিশাকর বাবু আর সরকার তাঁহার। জামাতার কথা শুনি দাসবুদ্ধি তিনি, চিন্তিলেন কতক্ষণ, পোষ্টাফিস পানে তবে গেলেন চলিয়া। পাইলেন গিয়া তথা পাত্তা জামাতার। জেলা যশোহরে তিনি, আছেন প্রসাদপুরে, বাঁধিয়া আবাস। অর্থাদি লইয়া সাথে সেই সূত্র ধরি, নিশাকরে লয়ে সাথে গেলা সেই দেশে। (বাড়িয়া চলেছে দেখ বিধবা অনল।) বিস্তর সন্ধান করি, গোবিন্দের বাসস্থান করিলা নির্ণয়। তবে একদিন, নিশাকর দাস তিনি চতুর বিষম, করিলা গমন তথা। "হেরি নিশাকর দাসে, পর্দ্দার ভিতর হতে রোহিণী রূপসী, ভাবিলা আপন মনে,—'এসেছে দেশের লোক, বাড়ীর সংবাদ তবে পাইব নিশ্চয়।' কিন্তু সে গোবিন্দলাল সন্দেহ করিয়া, নিশাকর সহ নাহি করিলা আলাপ, দিলা খেদাইয়া তাঁরে। অগত্যা সে নিশাকর ত্যজি সে আবাস; সে বাড়ী বেড়িয়া আসি দাঁড়ান পাঁদাড়ে, সুন্দর কানন ভূমে জানালা সমীপে। দেখিলা জানালা দিয়া রোহিণী তাঁহাকে। অমনি সে নিশাকর কহিলা তাহাকে। "বাড়ীর সংবাদ তব আছে মোর কাছে—বলিয়াছে ব্রহ্মানন্দ।—বাবুর ভয়েতে, এখানে দাঁড়ায়ে তোমা' না পারি কহিতে। পুষ্করিণী-পাড়ে তুমি আসি সন্ধ্যাকালে, লইও সংবাদ যত, দাঁড়ায়ে থাকিব তথা তব প্রতীক্ষায়। রোহিণী প্রস্তাবে তাঁর করিলা স্বীকার।

তবে নিশাকর বাবু, অন্য এক লোক দিয়া, গোবিন্দের এক দাসে করিলা সংবাদ, —"তোমাদের বাড়ী হতে যুবতী জনৈক, নিশাকালে অভিসারে যায় দেখি আমি; আজিও যাইবে বামা। বাবুরে কি হেতু তুমি না বল এ কথা? এরূপ শুনিয়া দাসি উঠিল চমকি, কহিল—"এমন কথা! নিশ্চয় বাবুকে আজি করিব সংবাদ, হাতে হাতে পাপী তার দিব ধরাইয়া।"

৭ * দাসবুদ্ধির ভীষণ ফল। * ৭

সন্ধ্যাকালে নিশাকর সরঃতীরে আসি, বসিলা হরিত ঘাসে। কতক্ষণ পর তবে আঁধারে আঁধারে, আইলা রোহিণী তথা। নিশাকর রসভাবে কহিলা তাহারে। "এ কেমন ছল তব কহ তো সুন্দরী! তব আশাপথে রাখি আঁখি প্রতীক্ষার, বসি ডাঁশ মশা মাঝে, তুমি কিনা এতক্ষণে দিলে দরশন।" কহিলা রোহিণী শুনি ক্ষমা ভিক্ষা চাহি। "কি আমি করিব বল, বাবুরে করিতে শান্ত বিলম্ব এতেক। এতে অপরাধ কোন না কর গ্রহণ।"

এইরূপে নিশাকর, সন্দেহজনক কথা আদি রসেভরা, কহিছে রোহিণী সহ ; সে হেন সময়ে, আইলা গোবিন্দ তথা শমনের প্রায়। পশি বচসার ভাবে, রোষে বিবসিয়া কেশ ধরি রোহিণীর, টানি বীরবলে তারে আনিল আবাসে, কহিলন ক্রোধে কাঁপি। "তুই পাপিনীর তরে, ত্রিসংসার অন্ধকার করিলাম আমি, ভ্রমরে ছাড়িনু রাজ্য দিনু লুটাইয়া,—আর তোর এই দিশা!" এই বলি গুলি করি মারিলা তাহারে। (বিধবার শেষ দশা, দেখ কি ভীষণভাবে আঁকিলা সম্রাট।—কেন যে আঁকিলা কবি দাসবুদ্ধি ব্যক্তি যারা পারে কি বুঝিতে?—দেখ হে পাঠক তুমি চিন্তি' মনোমাঝে, দেশে যবে চলিতেছে বিধবার বিয়ে, কি হেতু গোবিন্দ তবে না করি বিবাহ, রোহিণীর সাথে পাপ করিল এরূপে?—যে পাপের শেষ ফলে, আবাস সর্ব্বস্বে তাঁর পড়িল অনল।—কার ভয়ে কেন তিনি, গেলেন স্বদেশ ত্যজি প্রবাসে যশোর?—এততেও যদি তুমি, কবির মনের কথা না থাক বুঝিয়া; কল্পনায় তবে তুমি, দাও বিয়ে গোবিন্দের রোহিণীর সাথে; রাখ তাঁহাদের তুলি স্বতন্ত্র আবাসে, দেখ তারপর ভাবি।—ভ্রমর মরিবে কেন, কেন বা পড়িবে বাজ আবাসে তাঁদের, সোনার সংসার কেন মিলাবে ধূলায়?—বরং দেখ না চেয়ে, লক্ষ্মীশ্রী তাঁহাদের বাড়িবে কিরূপে, কিরূপে বাড়িবে বংশ।—পরিশেষে চিন্ত মনে, বিধবা-বিবাহ-হওয়া ন্যায় কি অন্যায়। কবি এই ছবি আঁকি' বলিছেন তোমা'—'যদি বিয়ে নাহি দাও, আবাস সর্ব্বস্বে তব লাগিবে আগুন, মরিবে গোবিন্দ প্রায়; আর যদি দাও, সুখের সংসার তুমি বাঁধিবে তাহাতে। ধনে-পুতে লক্ষ্মীলাভ হইবে তোমার।)

(দাসবুদ্ধিবীর তাই নিশাকর দাস, রোহিণীরে ত্যাজ্যা তিনি কর্ত্তার তরে, খেলাইলা যে কৌশল, শেষ ফল সে কাজের হইল ভীষণ। রাজবুদ্ধিগও ব্যক্তি হইতেন যদি, শেষ ফল কি হইবে, সে চিন্তা প্রথম করি করিতেন কাজ। আমরাও দাসবুদ্ধি, শেষ ফল না ভাবিয়া তুলেছি হুজুগ, মরিতেছি ধনে-প্রাণে, পড়িতেছি আর কত অযথা বন্ধনে।—এত পরিচয় দিই গোলাম বুদ্ধির, তথাপি তথাপি দেখি, এ গোলাম জ্ঞান ত্যাগে মতি গতি নাই।

৮ * বিষফল। * ৮

রোহিণী মরিয়া গেলে গুলির আঘাতে, শবদেহ ত্যজি তার, গোবিন্দ লইয়া প্রাণ

এবে তার ফল ফলে কি ভীষণ। খুনের সংবাদ যবে পৌঁছিল পুলিশে, আইল দারগাবৃন্দ, কিন্তু কোনরূপে, খুনীরে ধরিতে নাহি পারিল তাহারা। পরিশেষে একজন, নামেতে ফিচেলথান—ডিটেক্‌টিভ তিনি, আনিলা খুনীরে ধরি। সাক্ষীর অভাব ছিল; তিনজন সাক্ষী তিনি লইলা সাজায়ে। বিচারে তখন, গোবিন্দলালের হয় সেশন সোপর্দ্দ। (শিমুল ফুলের প্রায়, ফোটে মনোহর ফুল বাসনা-মোহন, বিধবা-তরুর শিরে, কিন্তু ফলে বিষফল তুলা গরলের। সরল সমীরে যাহা, পাড়ার প্রত্যেক ঘরে পড়ে ছড়াইয়া, পোড়ায় সবার প্রাণ জ্বালি বিষবাতী।)

তখনি মাধবীনাথ যাইয়া সত্বর, করিলেন এ সংবাদ ভ্রমর সমীপে। উদ্ধারিতে প্রাণেশ্বরে, গুণবতী পত্নী তাঁর দিলা বহু ধন; মাধবী লইয়া তাহা আইলা যশোর। বলাইতে সত্য কথা, সাক্ষী তিন জনে ধন দিলেন অনেক। তাহারাও কার্য্যকালে সত্য বাখানিল। বিচারে গোবিন্দলাল হইলা নির্দ্দোষ। সানন্দে বাহিরে আসি আদালত হতে, গোবিন্দলালের দেখা কোথা না পাইল। (কেন তিনি পলাইলা, দাসবুদ্ধি ব্যক্তি তারা নারিলা নির্ণিতে।—মিত্রতা করিতে গিয়া, দাসবুদ্ধি ছিল বলি শ্বশুর তাঁহার, এই ফাঁদে জামাতারে দিলেন ফাঁসায়ে; সেই দুঃখে এ জামাতা গেলা পলাইয়া।—অগত্যা মাধবীনাথ, নিশাকরে লয়ে সাথে ফিরিলা আবাসে। দাসজ্ঞানী যারা তারা বিপত্তির কালে, করে যে কৌশল ফন্দী, পড়ে শেষ সেই ফাঁদে আপনি আপন। পক্ষান্তরে যারা, অন্যকে ফেলিতে ফাঁদে গড়ে দুষ্ট ফাঁদ, তাতেও তারাই পড়ে। ফাঁদ গড়িবার ফন্দী, দাসজ্ঞানী জন যারা না জানে তাহারা।

আরো কতিপয় দিন গেল অতিবাহি, পতির চিন্তায় কাঁদি যুবতী ভ্রমর, বসিলা মরিতে এবে। একে একে গেল সাত বৎসর কাটিয়া, না পাইলা সে অবলা পতির চরণ। দিন দিন বাড়ি পীড়া হয়েছে ভীষণ; বলিতে লাগিল সবে—'আজি নিশা ভ্রমরের বুঝি না পোহায়।' সে হেন নিদানকালে অন্তিম সময়ে, আইল গোবিন্দলাল আবাসে আপন। ভ্রমর সে মুখ দেখি, কাঁদিলা শয্যায় পড়ি অচল লোচনে। বিছাইয়া বিছানায় গিয়াছে শরীর, উঠিতে শকতি নাই; ক্ষীণ কলেবরে জল ফেলি নয়নের, জানাইলা মনোদুঃখ; তা' দেখি গোবিন্দলাল কাঁদিয়া আকুল। স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা, আর যেই পূত-প্রেম ছিল দুইজনে, ধিক্কারিলা আপনাকে ভয়ঙ্করভাবে; করিলেন তিরস্কার, মনে মনে নাক কান মলিলেন কত।—ঝরিল নির্ঝরে বারি, ভাসিল হৃদয়, হ'ল বাক্যরোধ তায়। আপনিই আপনাকে করি

করিনু! কেন বা সেরূপ মতি হইল আমার!—আমার সে পাশে বুঝি হারানু ভ্রমরে।' তবে করযুগ যুড়ি, ভ্রমরের পানে চাহি লাগিলা কাঁদিতে। "ক্ষমা কর প্রাণেশ্বরী, তোমার পবিত্র প্রাণে, কত যে বেদনা আমি দিনু কতরূপে, না পারি কহিতে তাহা।" এই বলি মুখে মুখ রাখি সে সতীর, কাঁদিলা কাতর স্বরে— "রোহিণী নরকে গেছে ক্ষতি নাই তায়, ভ্রমর আমার ওগো—প্রাণের ভ্রমর কেন চলিল স্বরগে।—কে দিল কি ধূলাপড়া এ চোখে আমার, কি মন্ত্রে কাহার মুগ্ধ হইনু কোথায়; আমার ভ্রমরে ওগো! প্রাণের ভ্রমরে ভুলি আছিনু কেমনে!"— নির্ব্বাক্ নয়নে সতি, পতি পানে এক ধ্যানে চাহিয়া চাহিয়া, প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করিল তাঁহার। তা' সহ তখনি, পড়িলা গোবিন্দলাল হারায়ে চেতন। উঠিল রোদন ধ্বনি, তা' সহ যতন সেবা গোবিন্দলালের। (বিধবা-অনল হয় কত ভয়ঙ্কর, দেখ হে পাঠক এবে, থাকে যদি সেই হেন আঁখি দেখিবার!—দেখ কবি কি প্রকারে, কি ভাবে এ ছবি আঁকি, কি মহা কৌশলে তোমা দেন চক্ষুদান। তথাপি তথাপি তুমি এমন অজ্ঞান, এ অনল-নরকের লুকাও আঁচলে। পুড়িছে বসনসহ সরম ভরম, অনলে তথাপি জল কভু না ঢালিবে। এই তব মহাপাপে, দিন দিন সল্পসংখ্য হতেছ তোমরা, চলেছ নির্ম্মূল হতে, তথাপি সুবুদ্ধি কেন না উদে মাথায়!)

দ্বিতীয় দিবসে তবে, পাইল গোবিন্দলাল চেতনা তাঁহার। পূর্ব্ব স্মৃতি লুপ্ত প্রায়, পাগলের দশা তাঁর হ'ল সেই হ'তে। আহার বিহার ছাড়ি, কতিপয় দিন তিনি থাকিয়া আবাসে, অবশেষে নিরুদ্দেশে গেলেন চলিয়া।—(একটি বিধবা হ'তে, এত সর্ব্বনাশ যবে ঘটে এ দেশের, কত সর্ব্বনাশ তবে, সকল বিধবা হতে ঘটিছে দেশের, দাসবুদ্ধি পরিহরি পার কি বলিতে? এই হেন হীনবুদ্ধি ভরিয়া মাথায়, বুদ্ধির গৌরব তুমি কর কি লজ্জায়? স্বদেশীহুজুগে, নেতা হইবার যোগ্য ভাব আপনাকে! ও তব গোলামজ্ঞানে, যা' কর তাতেই ফল ফলাও ভীষণ।)

৯ * ভগ্নীহীনের ভাগিনেয়। * ৯

গোবিন্দের ভাগিনেয় শচীকান্তবাবু, সম্পত্তির অধিকারী হইল তখন। (এক-মাত্র পুত্র যবে গোবিন্দ পিতার, না ছিল ভগিনী তাঁর; উইলেও নাম নাহি পাইনু কাহার।—দেখিলাম ভাগিনেয়, পতিত কল্পনা বলে কবি ঠাকুরের।) এ আবাসে আসি শচী, সাজাইলা রূপান্তরে বারুণীকানন। নির্ম্মিলা মন্দির এক, রাখিলা

দুঃখে সুখে দোষ গুণে ভ্রমরের মত,
থাক যদি গুণবতী কেহ এ সংসারে,
এস, এ প্রতিমা দান করিব তাহারে।

কতকাল পর এক সন্ন্যাসী আসিয়া, মন্দির দেখিতে চান। অতি কুতুহলী তায়, শচীকান্ত সন্ন্যাসীরে দেখান মন্দির, আর সে প্রতিমা চারু ভ্রমর সতীর। অতি ভক্তি সহকারে, পদতলে প্রতিমার বসিলা সন্ন্যাসী। এক মন ধ্যানে তিনি করযুগ যুড়ি, স্থির নয়নে চাহি থাকি কতক্ষণ, কাঁদিলা ফুৎকার দিয়া—"কি কব দুর্ম্মতি আমি, মহা গুণবতী তুমি আছিলে আমার, নারিনু চিনিতে তোমা, বহু ব্যথা দিনু হায়, পরাণে তোমার; সকলি সহিয়া তুমি নিলে নিজগুণে। নরাধম আমি, করেছি তোমারে হত্যা, পাতকিনী রোহিণীর পাপ প্রেম পেয়ে। ভ্রমর, ভ্রমর! তুমি আছিলে আমার, বড় পতিব্রতা সতী, আমারি পাপেতে আমি হারানু তোমায়।—এরূপে হারানু তোমা, আর না পাইনু কোথা সহস্র সন্ধানে।—আজ তব সেই মূর্ত্তি দেখেছি নয়নে, আর না যাইব কোথা! তোমারই চরণে পড়ি রহিব এখানে।" এই বলি করপুটে, দরদরে সে সন্ন্যাসী লাগিলা কাঁদিতে।

চিনিতে পারিয়া শচী, ধরি মাতুলের গলা কাঁদি কলরবে, কহিলা কাতরস্বরে।—"আসিয়াছ মামা তুমি, ভাসিয়াছি আমি তায় আনন্দ সলিলে। আবাস সর্ব্বস্ব তব করিয়া গ্রহণ, রহ মামা এই স্থলে।" এই বলি চাহিলেন তুলিতে মাতুলে; করিলা বিষম বল। কিন্তু হেলাইতে তাঁরে নারি কোনরূপে, কাঁদিলা চরণ ধরি মিনতির স্বরে। বিফল হইলে তাহা, তখন দেখিলা চাহি, মাতুলের মুখপানে করি নিরীক্ষণ। হেরিলা প্রবাহে বারি ঝরিছে নয়নে। করযুগ ধীরে ঝুলি, পড়িল সে ভ্রমরের চরণ যুগলে। প্রতিমা সম্মুখে তিনি, প্রতিমা হইয়া এবে রহিলা বসিয়া।

কতক্ষণ শচীকান্ত করিলে মিনতি, ক্ষীণস্বরে অতি ধীরে কহিলেন তিনি।—"পার যদি বাবা তুমি, লৌহের প্রতিমা এক গড়িয়া আমার, এইরূপে এইভাবে এ দেবীর পাশে, যদিও বসায়ে মোরে, মরিয়াও সুখ শান্তি পাইব তাহাতে।" এই বলি নীরবিলা, আর না কহিলা কিছু সহস্র যতনে। নিরুপায় শচীকান্ত, আবাসবাসীরে গিয়া করিলা সংবাদ। ঘোর কোলাহলে সবে আনন্দে মাতিয়া, আইলা দেবনভূমে। দেখিলা গোবিন্দলাল শীর্ণ অতিশয়, ভ্রমরের পদ ধরি আছেন বসিয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহি প্রাণবায়ু [illegible] তাঁহার।—এই দৃশ্য অপরূপ, দেখিতে গ্রামের

কিছুদিন পর শচী মাতুলের প্রতিমূর্ত্তি, গড়িবার তরে যবে হইলা প্রস্তুত,—'লৌহ বা স্বর্ণের হবে' সে কথা লইয়া গোল হইল অনেক। হরলাল সেই স্থলে বলিলা এরূপ—সুবর্ণ হইতে মূর্ত্তি গড়ি গোবিন্দের, রাখ তাহা ভ্রমরের দক্ষিণ প্রবেশে, শোভিবে উত্তম তায়। কত বাদ অনুবাদ চলিবার পর,—যেভাবে গোবিন্দ তাঁরে করিলা আদেশ, সেইভাবে শচীকান্ত গড়ি সে মুরতি, দিলা বসাইয়া সেই দেবীর সম্মুখে; বসিল গোবিন্দ মূর্ত্তি ভ্রমর মূর্ত্তির ধরি তুখানি চরণ। আর এক মূর্ত্তি শচী গড়ি রোহিণীর, রাখিলা সামান্য দূরে। কলের প্রতিমা সেই, করিলে আগুন দান ভরিয়া বারুদ, করে সে রোহিণীমূর্ত্তি অগ্নির ফুৎকার। পড়ে সে পাবক আসি, গোবিন্দ ও ভ্রমরের শরীর বেড়িয়া।—বৎসরে বারেক শচী, দেখাতেন সেই লীলা বসাইয়া মেলা। লোকে লোকারণ্য তায় হইত তথায়।

আর সেই মনোহর মন্দির প্রাচীরে, দিলা লিখি স্বর্ণাক্ষরে, কবির উদ্দেশ মত যত উপদেশ। সেই উপদেশ মত, স্থানীয় দুর্ম্মতি যত হইল সুশীল। শচীর সুনাম তায় রটিল চৌদিকে, আর নাম ভ্রমরের।

"রোহিণীর পানে চাহি রাজবুদ্ধি বলে, গভীর চিন্তার চোখে, বিধবা-জীবনী পাঠ কর দেখি তুমি!—বিধবার বহ্নানল, করিতে পর্ব্বত ভেদ পারে কি না পারে?—নগরকে মরুময় দেশ ছারখার, করিতে সক্ষম কি না?—তোমার জ্বালায় জ্বলি, যবে সে বিধবা, পরধর্ম্মে পশি চায় জুড়াতে জীবন; তখনও তোমরা, অবলার সেই কাজে কেন দাও বাধা? কর দ্বন্দ্ব ক্লেস্কার ছড়াও চৌদিকে!—দেখ না চিন্তিয়া মনে, যে অনল বক্ষে তার দিয়াছ জ্বালিয়া, সে পাবক নরকের, আবাস সর্ব্বস্ব তব পোড়াইছে কি না?—সংখ্যায় হতেছ হ্রাস, যেতেছ গোল্লায় সবে সেই এক পাপে। তথাপি তথাপি তুমি, দারুণ কৃপণ-জ্ঞান দূরদরশনে, বিধবার বিয়ে দিতে নাহি দাঁড়াইবে।" এই কথা লিখি শচী রাখিলা প্রাচীরে!

ওগো তুমি বিশ্বগ্রাসী বিধবা রূপসী! বল দেখি সত্য করি, কেন করিতেছ ভবে এত অত্যাচার? ও তব বৈধব্যানল ফেলি বাড়ী বাড়ী, কেন পোড়াইছ সদা? আবাস সর্ব্বস্ব ভস্ম করিছ কি হেতু, উচ্ছন্নে দিতেছ দেশ কাঁদাইছ সবে?—কেন পড়ি বাড়ী বাড়ী ডাকাতিনী হেন, লুটিছ সর্ব্বস্ব যথা দিতেছ লুটায়ে, পৈত্রিক সম্পত্তি সহ? কিরূপ রাক্ষসী তুমি, কি অনল বলে, অস্থি মাংস সবাকার খাও চিবাইয়া?—কর জীর্ণ হর্ম্ম্যাবলী আস্ত এ জগত?—এ অনল নরকের, কেমনে পাইলে কোথা কে দিল তোমায়, তুমি বা কেমনে কহ, সাজিয়া শয়তান-পত্নী কুরীতি দেখাও?

১০ * বিধবার আর্‌গুমেণ্ট। * ১০

উত্তরিল নিজ তেজে বিধবা সুন্দরী।—"দাসজ্ঞানী জন তুমি, বুঝাইলে তোমা তুমি কবে তা বুঝিবে?—তুমি যা ভেবেছ তব দাসবুদ্ধি বলে, শতগুণ তার, করি আমি অত্যাচার তোমা সবা পরে। এ অনল নরকের, তোমরাই দেছ ভরি প্রাণে আমাদের, তথাপি অজ্ঞান প্রায় জিজ্ঞাসিছ কেন?—আমরা অবলা জাতি, সে অনল নরকের গাঁথিয়া হৃদয়ে, পুড়িতেছি অহর্নিশ; নির্দ্দয় তোমরা, কোন প্রতিকার তার না কর কেহই। যদি কোন দয়াবান, জলের কলসী লয়ে নিবাতে অনল, আসে আমাদের দিকে; দাও ভাঙি সে কলসী পথেই তাহার। তোমরা গোলামজ্ঞানী, পার কি বুঝিতে; কিরূপে আমরা, পাঁজার অনলরাশি পূজি এ পরাণে? আগ্নেয় পর্ব্বত প্রায় কি দিবা রজনী, হইতেছি ভস্মীভূত, ভয়ঙ্কর অনলের প্রবল প্রকোপে? যন্ত্রণায় জ্ঞানগুণ হারায়ে আত্মার, সচল পর্ব্বত মোরা, অগ্নি উদ্গীরণ করি দৌড়িয়া বেড়াই। সেই অনলেতে ঘর পোড়ে তোমাদের, হও সবে সর্ব্বস্বান্ত। আবাসে আবাসে তব, এ অনল-গিরি বাস করিলে, তথাপি, তোমরা পতিত নেত্রে না পাও দেখিতে, অনলের নাহি কর কোন প্রতিকার। থাকে যদি রাজবুদ্ধি ভেবে দেখ সবে,—তোমাদের দোষ ইহা নহে আমাদের।—আমাদের জঠরস্থ-ভ্রূণডিম্ব যত, তোমরাই অবিরত করিছ নিপাত; সে পাপের অভিশাপে পড়ি বিধাতার, হইতেছ ছারখার, দিন দিন লোকবলে হইতেছে হ্রাস। তোমাদের পাপ ইহা নহে আমাদের?—দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্থ লোক আসি আমাদের, যে সকল দুষ্ট রোগ দেয় সঙ্গোপনে, ছড়াইয়া আমরা তাহা করি দেশময়; অনেকেই তায়, মরে শেষ পঙ্গু-অঙ্গে ঘোর যন্ত্রণায়। করিছ যেমন, উপযুক্ত প্রতিফল পাইছ তাহার। আমাদের দোষ নহে দোষ তোমাদের।—আমরা সুশীলা অতি, তোমা পরে অত্যাচার করিব না বলে, যাই পলাইয়া কোন বিধর্ম্মীর ঘরে, বাড়াই তাদের বংশ ধ্বংস করি তব। সে কাজেও যবে তুমি, গাধাবুদ্ধি বলে বাধা দাও আমাদের; আনি তথা হতে তুলি, কুলে নাহি লও; তখনি আমরা ঘোর অত্যাচার করি তোমাদের পরে। তোমাদের দোষ ইহা নহে আমাদের।—বিধবা-বিবাহ যদি না দিবে তোমরা, কেন তুলে দিলে তবে চিতা আমাদের? তুলিলে কি সেই চিতা, প্রাণে প্রাণে বিধবার জ্বালিবার তরে? সাধে কি আমরা, তোমাদের প্রাণে প্রাণে জ্বালিতেছি চিতা! আমাদের নহে ইহা দোষ তোমাদের!—আমাদের ভ্রূণ হত্যা করিছ জঠরে। আমরা অবলা জাতি, বিচার

তাহার, না পাই রাজার কাছে; অগত্যা আমরা, বিরল গোপনে কাঁদি পদে বিধাতার। দয়া করি তাই তিনি, কামের কুহক-খাঁড়া দিয়া আমাদের, আদেশিলা বীর ভাষে,—'এই খাঁড়া করে লয়ে,পাঁঠাকাটা কর গিয়া দুর্ম্মতি সকলে! তোমাদের ভ্রূণহত্যা করিছে যাহারা; যুবজনে তাঁহাদের, নিষ্করুণ প্রাণে হত্যা করিয়া বেড়াও।—আমার এ সৃষ্টি ধ্বংস করিবার তরে, দাঁড়ায়েছে এই জাতি, বিধবা বিবাহে মতি নাহি রাখে তাই। এজাতি আমার শত্রু, অতি শীঘ্র এজাতিরে করিব নির্ম্মূল, ঘুচাব ভবের ভার। উহারা করুক হত্যা ভ্রূণ তোমাদের, তোমরাও কর হত্যা খাঁড়ায় ওদের; এই মহাগৃহ-দ্বন্দ্বে, অতি শীঘ্র এ জাতিরে করিব নির্ম্মূল। মরিবে এ জাতি, সমরেও যত লোক না মরে দৈনিক।' থাকে যদি কোন বুদ্ধি ও শিরে তোমার, দেখনা চিন্তিয়া তবে! তোমাদের লোকবল, কিরূপ প্রবল বেগে চলেছে কমিয়া। দাস-বুদ্ধি-ব্যক্তি তুমি পার কি বুঝিতে? সর্প হতে খল তুমি সহোদর তার; তাই এইরূপে সতত করিছ নিজ আত্মজ-ভক্ষণ। এখনও তাহাই তুমি, নাহি কর প্রতিকার বিধবা সবার, হীনবুদ্ধি হেতু মাত্র না পার গণিতে, কতদিন পরে আর, তোমরা এ ধরা হতে যাইবে মুছিয়া। বুঝিতে না পার আর তোমরা এখন, ছাড়িছ অন্তিম-শ্বাস পড়ি বিছানায়; বিকার বকিছ যত, দেখিছ কেবল মাত্র রাজ্যের স্বপন।—এ দোষ কি আমাদের অথবা তোমার?

১১ * জজের বিচার। * ১১

এই আর্গুমেণ্ট শুনি বিধবার মুখে, কহিতে লাগিলা জজ। "কি জাতি প্রাচীন অতি, জ্ঞানগুণ যত কিছু ফেলেছে হারায়ে, হয়েছে নিরস মাথা; দুর্ব্বল-জ্ঞানের-দোষে না পারে বুঝিতে, তাই নষ্ট করিতেছে নিজ লোকবল। দেখিছ না দশা ওর, বসিয়াছে স্মৃতিহারা বুড়া এ বাড়ীর, চাহিছে কেবল খেতে; বউব্যাটা সকলের, অবিরত অপবাদ দিতেছে বসিয়া—'সকলে খাইল খেতে না দিল আমায়।' পুণ্যে রুচি নাই কোন, সম্পাদ বৃদ্ধির, কোন উন্নতির দিকে না দেখে চাহিয়া, বসিয়া বসিয়া বুড়া, শিশুর হাতের লাড়ু খাইতে কাড়িয়া। বাড়ীর বালাই হয়ে বসেছে বিরলে। যত ছুঁচাবাজী খেলা খেলিছ তোমরা, দেখিয়া না দেখে তাহা। সর্ব্বদিকে উদাসীন, 'অন্ন দাও অন্ন দাও' বকিছে কেবল। মরিবে এখনি, তথাপি খেয়ালে দেখে 'দীর্ঘ পরমায়ু'।—অন্তিম শয্যায় যবে শুয়েছে এ বুড়া, কহিছে অন্তিম-বাণী

উপদেশ দিব আমি—কারে দিব বল? দণ্ডই বা দিব কারে, কোন বস্তু ঐ দেহে দেখিছ কি তুমি? শীঘ্রই মরিবে বুড়া, তখন তোমার হাড়ে লাগিবে বাতাস। যে ধর্ম্মে হইবে ইচ্ছা করিয়া প্রবেশ, থাকিও স্বাধীন ভাবে।—ইতিপূর্ব্বে বহুবার, ভগ্নীভ্রাতা তোমাদের বুড়ারে ছাড়িয়া, পশিয়াছে অন্য ধর্ম্মে; তোমরা রহেছ যবে, নানাবিধ এ বুড়ার সহি জ্বালাতন, থাক আর কিছুদিন। স্বাধীন শীঘ্রই হবে বুড়ার বিয়োগে, ঘুচিবে সকল জ্বালা। এ বিনা উপায় তব না পাই ভাবিয়া।”

এ আদেশ প্রচারিলে জজ মহাশয়। আদালতে ছিল তথা যত মুসলমান, তাঁহারা অন্তর তলে চিন্তিলা এরূপ।—“এ মুমূর্ষব্যক্তিসহ, কি জ্ঞানে আমরা চাহি করিতে একতা! বিকার বকিছে যত, একটি বচন সত্য না বলে ভুলিয়া, কি বিশ্বাস করি মোরা এ লোকের পরে! আমাদের প্ররচিত, গ্রন্থাদি সংবাদপত্র না পড়ে যাহারা, না রাখে সাংবাদ কোন, গৃহের আমারি, গৌরব বংশের মোর, শাস্ত্র সাথে প্রেম করি কি লাভ লভিব। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর, বিধবা-সাধবা আদি অবশিষ্ট যত, সম্বল সম্পাদ সহ হবে আমাদের, কি কাজ দ্বন্দ্বিয়া তবে বৃদ্ধের সহিত।” এইরূপ চিন্তি মনে করযুগ যুড়ি, নিবেদি জজের পদে লাগিলা কহিতে। “বাঙ্গালা সাহিত্য মোরা না চাহি পড়িতে, রচিত হিন্দুর যাহা। উহার পাঠেতে, আমরাও হইতেছি ভ্রান্ত অতিশয়, তাই দৌড়িয়াছি, মুমূর্ষ জাতির সাথে করিতে একতা; দিতেছি বেদনা, পারিতেছি যতরূপে প্রাণে আপনার। এ সাহিত্য আমাদের, পৃথক করিয়া দিলে হইবে উত্তম। বিবেচি দেখুন মনে, এরূপ করিলে, কভু না উদিবে দেশে হুজুগ এরূপ।” কতিপয় মুসলমান, পড়িয়া হিন্দুর গ্রন্থ অর্জ্জি দাস জ্ঞান, মিশেছে ওদের সাথে গান্ধির হুজুগে। তারাই হিন্দুকে দান করিছে কোর্ব্বাণ– করিবে ক্রমশঃ রোজা নামাজ বর্জ্জন, দাঁড়াবে পূজিতে মূর্ত্তি। আমরা যখন, রাজজ্ঞান পূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে শিখেছি, স্বতন্ত্র সাহিত্য তবে কেন না পাইব।”

এরূপ শুনিয়া জজ, মনে মনে বহুকথা করি আন্দোলন, আনন্দ পাইলা মনে, সুন্দর প্রস্তাব বলি গণিলা অন্তরে; কহিলা হসিত-মুখে;—“এ চারু প্রস্তাব তব, জানাইতে বড় লাটে কভু না ভুলিব। বড় উপকারী কথা, রাজবুদ্ধি বিনা ইহা কেহ না বুঝিবে।—প্রতিক্ষা করিও তুমি সুফল ইহার।” এই বলি সভাভঙ্গ করিলেন তিনি।—আমরাও করিলাম ইতি এ গ্রন্থের—কেবল দেখাব নীচে সংক্ষিপ্ত কথায়, দাসজ্ঞানে রাজজ্ঞানে প্রভেদ কিরূপ। যদি তায় কিছু জ্ঞান জন্মে পাঠকের,

গোলামবুদ্ধি ও রাজবুদ্ধিতে প্রভেদ কি ?

ভুত-ভবিষ্যাদি ভবিতব্যদর্শী বুদ্ধিকে উন্নত, উৎপন্ন, বা রাজবুদ্ধি বলা যায়। রাজবুদ্ধির ফল বহুকালাবধি পুরুষানুক্রমে ভোগদখলে থাকে; সমগ্র দেশ বা সম্প্রদায় ইহার দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। ইহার আয়তন বহুদূরব্যাপী। ইহা গোলামবুদ্ধির মত সঙ্কীর্ণ, নিরুৎপন্ন, ব্যক্তি ও স্বার্থগত বা অস্থায়ী নহে। গোলামেরা পতিত বুদ্ধি চালনা করিয়া, যে সকল কর্ম্মফল ফলায় তাহা চকিতে বিলীন হইয়া যায়, দেশ বা সম্প্রদায়ের কোনই উপকারে আসে না।

রাজবুদ্ধির অনুভব, অনুমান, দূরবীক্ষণ ও কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রবল ও ধ্রুব-সত্য হইয়া থাকে। দুষ্ট-শিষ্ট, জ্ঞানী-মুর্খ, প্রতারক প্রবঞ্চক, ফন্দিবাজ, দাগাবাজ যে কোন স্বভাব চরিত্রের লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, রাজবুদ্ধি তাহাকে দর্শন ও তাহার বচন শ্রবণ করিবামাত্র, তাহার আত্মার দোষগুণ ও অন্তরের অভি-সন্ধি ও মনের ভাবরাশি পলকে উদ্ভাবন করিয়া লইবে। কাজেই রাজবুদ্ধি ঠকিতে বা ঠকাইতে জানে না। দাসবুদ্ধিতে ঐ সকল সদ্‌গুণ আদৌ নাই, সে ইহার অবিকল বিপরীত। দাসেদের মস্তিষ্ক-মকুর, শিক্ষার দোষে এমন ভাবে সংস্থাপিত যে, জীবন যবনীকার ছায়াগুলি তন্মধ্যে পতিত হইবার সময়, সোজাভাবে না পড়িয়া উল্টা হইয়া পড়ে, সেহেতু তাহারা উল্টাকে সোজা মনে করিয়া, যে কোন কার্য্য করিতে দাঁড়ায় তাহারই ফল বিপরীত হয়। এই বিপরীত ফল, চারি সহস্র বৎসর হইতে ফলিতে থাকিলেও, গোলামজ্ঞান হইবার কারণে দর্পণের স্থান বিনিময়ের কথা কাহারও মাথায় উদয় হয় না। দুষ্য-শিক্ষার অঙ্গুলী, এই গোলাম-জাতী লোকেদের চক্ষে এমনভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, ইহারা একটাকে দুইটা দেখে, এবং এইরূপ গণনায় ভুল করিতে থাকিলেও, অঙ্গুলী তুলিয়া দিবার কথা কাহারও মাথায় উদয় হইবার নহে। তাই বঙ্কিমবাবু অনেকস্থলে বলিয়াছেন—বাঙ্গালী যতই শিক্ষালাভ করুক, ইহাদের বুদ্ধি ফিরিবার নহে। তিনি ইহাদিগকে পতিত বলিয়া জানিতেন, তাই তিনি ঐ জাতির রসনারুচ্য গ্রন্থ সকল লিখিয়াছেন।

দাসবুদ্ধি, কখনই রাজবুদ্ধির চালে বা কৌশলে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারা সকলস্থলেই বিপরীত বুঝিয়া থাকে এবং শত্রু-শক্তিকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া লয়। 'গান্ধিকে জেলে দিলে, এই চলিত আন্দোলন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিবে।' পতিতবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই বদ্ধ বিশ্বাসে আবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকালে কি হইল!

দাসেরা মনে করে তাহার কৌশলে রাজবুদ্ধি কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে

না। এই বিশ্বাসই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। আর এক মহাদোষ এই যে, দাসের পরাজয়ের ভিতর দিয়াও নিজেদের জয় দেখিতে পায়; দুষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর শিষ্টতা, অসতীর ভিতর সতীত্ব, দস্যুদের মধ্যে রাজবুদ্ধি ইত্যাদি দেখিতে তীক্ষ্ননেত্র রাখে।

পুষ্করিণীর পানার মত দাসেরা জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাদের মূল মৃত্তিকায় প্রথিত নহে বলিয়া ইহাকে 'খমূলী' বলে। ইহারা বাতাসে তাড়িত বা চালিত হয়, যখন যেমন বাতাস পায় তখন তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া পুষ্করিণীর এক প্রান্তে ঘেঁসাঘেঁসি ঠাসাঠাসি হইয়া এমন ভাবে দাঁড়ায় যে, তখন তাহাদিগের নির্ম্মূলকরা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। এ জাতি জলের তলদেশস্থ পাতালদর্শী-জ্ঞান সঞ্চয় করিতে কখনই সক্ষম নহে। পক্ষান্তরে শতদলশোভী রাজবুদ্ধি, পাতালে জড় গাড়িয়া জলের উপর আসিয়া ফোটে; ইহারা অনিলের গলা ধরিয়া নাচে, পবনেও ইহার ক্ষতি করিতে পারে না। পুষ্করিণী শুকাইয়া গেলেও ইহারা নিশ্চিহ্ন হয় না, (কামাল পাশার মত) বর্ষাবারিতে পুষ্করিণী পূর্ণ হইলেই আবার তাহারা তথায় ফুটিয়া বসে। সমস্ত সরোবরের জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু করিয়া রাখে; কিন্তু কি ভাবে সেই দেশহিতকর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া জল পরিষ্কার ও সুস্বাদু করে, তাহা দাসবুদ্ধি ব্যক্তিদের বুঝিবার বিষয় নহে।

প্রকৃতির নিয়ম মতে ক্ষুদ্রপ্রাণী সকলের বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই নিয়ম মতে শতদল অপেক্ষা পানার বৃদ্ধি বেশী হয়, এবং পানার প্রাচুর্য্যে শতদলের সর্ব্বনাশ ঘটে। সেইজন্যই বঙ্গদেশ, পানার চাপে শতদল-শূন্য হইয়াছে।

সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত বাক্যলীলার, সত্য হইতে মিথ্যাগুলিকে পৃথক করিয়া লইবার ক্ষমতা রাজবুদ্ধিকে আছে, দাসবুদ্ধিকে নাই। মিথ্যাবাদীরা সত্য বলিতে বলিতে, যখন তাহার মধ্যে মিথ্যা কথা যোগ করিয়া দেয়, সেই সময়ে তাঁহার স্বরে যে একটু সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, রাজবুদ্ধি তাহা অনুশীলন করিতে সক্ষম হইলেও দাসেরা হয় না; এবং বক্তা সেই মিথ্যাগুলির বর্ণনকালে, কথার সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না; তদ্বারা সে সহজেই ধরা পড়ে। পাঠক যদি সূক্ষ্ম শ্রবণে কাহারও কথা শ্রবণ করুন, তবে তখনি বুঝিবেন, বক্তা সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা।

রাজবুদ্ধি, অতি নির্ম্মল ও উজ্জ্বল, অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ, অতি স্বার্থশূন্য সৌম; অতি বুদ্ধি কৌশলী ও উৎপন্ন জ্ঞান; গভীর পাতালদর্শী ও বীর আবিষ্কারক, অতি সত্যকল্পী ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষক, ধীর ও শীতল মস্তিষ্ক, বাক্যবিন্যাসে সামঞ্জস্য রক্ষক মান সম্ভ্রম ও সম্পদ সম্পত্তির ...

মানসম্ভ্রমাদি ও সৌভাগ্য সকল তাঁহার অন্বেষণে থাকে। সকলস্থলেই বিশ্বাসী এবং শান্তির সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে গোলামেরা ঐ সকল সদ্গুণের বিপরীত। গোলামেরা শোনে এক বোঝে আর, শোনায় অন্যরূপ এবং করে অপরূপ। এইজন্য কোন উপদেশই গোলামবুদ্ধিকে সত্যপথে আনিতে পারে না। শিক্ষার অভাবে লোক মূর্খ বা নিরক্ষর হয় কিন্তু গোলামবুদ্ধি হয় না। কত কত অশিক্ষিত লোক, তাঁহাদের দেবদুর্লভ কার্য্যকলাপে, সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াপন্ন ও পুরুষানুক্রমে অনুগত করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

রাজবুদ্ধি স্বকীয় জ্ঞান-গুণের দিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ; আত্মার উজ্জ্বল রত্ন সকল আদৌ দেখিতে পায় না, তাই সে নিজকে নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়জ্ঞান করিয়া সকল কার্য্যের অনুপযুক্ত মনে করে। গোলামেরা তাহার বিপরীত। জগতের সকলেই তাহার নিকট তুচ্ছ ও হীনজ্ঞান, এবং সে নিজেকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণবান, সুকল্পী, বীরবুদ্ধি, জাতিতে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মে মহাধুর্য্য, সভ্যতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, চালচলন ও আচার-ব্যবহারে অতি উচ্চ, সকলের অপেক্ষা পবিত্রাঙ্গ ও স্পর্শে বিভূষিত হয় ইত্যাদি মনে করিয়া, গোলামবুদ্ধির প্রকৃত পরিচয় দিয়া থাকে। এই গোলাম জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, তখন তাহারা বিজাতীর ছায়া মাড়াইলে, গঙ্গাস্নান করিতে দৌড় দেয়। গোলামজ্ঞানীরা দারুণ অদুরদর্শী ও অতিশয় কৃপণ-জ্ঞান হইবার কারণে ; যখন তাহারা দূরদেশবাসী কোন এক নিরুদ্দিষ্ট হিতৈষীর নিকট হইতে ডাকে অর্থ প্রাপ্ত হয়, তখন সে মনে করে যে, ডাকপিয়নই তাহার প্রতি সেই অনুগ্রহ করিতেছে, তাই সে,অন্ধরজনীর ন্যায়, বাঞ্ছারামকে ভুলিয়া অমরনাথকে হিতৈষী বলিয়া গ্রহণ করে। এই কৃপণজ্ঞানের বশীভূত হইয়া, সত্য জগৎকর্ত্তাকে বিস্মৃত করিয়া, তাহারা তাহার প্রতিমার প্রতি সম্মান দান করিয়া থাকে। এই প্রতিমাই তাহাদিগের কৃপণ-জ্ঞানের শিক্ষাদাতা ও যাবতীয় দুষ্কল্পনার সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ। অত্যন্ত স্বার্থপর এবং আত্মহিতৈষণায় আত্মোৎসর্গী হইবার কারণে, তাহাদের দ্বারা দেশের বা সম্প্রদায়ের কোন উপকার হইতেই পারে না। যাহারা সে আশা করে তাহারাও ঐ জ্ঞানে মস্তবিজ্ঞানী। তাহাদিগকে দেশহিতৈষণার দিকে আকৃষ্ট করিলে, তাহারা তখন দেশহিতৈষণার ভাণ ধরিয়া আত্মহিতৈষণায় দণ্ডায়মান হয়।

কতিপয় উপমা।

এই [illegible] দেশহিতৈষীরা [illegible]

হিতৈষণায় ব্যয় করিতেছে কি না? বিগত প্লাবন উপলক্ষে যে এক দেশব্যাপী চাঁদা উঠিল তাহা যে পাঁচকোটি টাকার কম কিছুতেই হইবে না, তাহা দাসবুদ্ধিদিগের অনুমাণের অন্তর্গত না হইলেও রাজবুদ্ধিরা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। সেই পাঁচকোটির মধ্যে পাঁচলক্ষ টাকা যথাস্থলে পৌঁছিয়াছে কি না—সন্দেহ? এই মহা দেশহিতৈষণার হুজুগে এই কলিকাতা নগরেই অন্যূন ৫০০ দল লোক,ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের হৃদয়বিদরী কাঁহুনী শুনিয়া, লোকেও যথাসাধ্য দান করিয়াছে। গান্ধি মহাত্মার চাঁদায় লোকে যে পরিমাণ অর্থ দান করিয়াছিল, এ চাঁদায় তাহার দশগুণ পরিমাণ দিয়াছে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ হয় না। সে সমুদায় টাকা কি হইল। ভিক্ষুকেরাই ভক্ষণ করিল না কি?—যে দেশের চরিত্র এইরূপ স্বার্থগত সে দেশের উন্নতি দেবতাদুসাধ্য নহে কি? এই চরিত্রদোষ সংশোধনের জন্য যখন কেহই কথা কহিবার নাই, তখন এদেশে চরিত্রবান কে? কাহার কথায় আমরা নাচিতেছি। যাহার আত্মারূপ রাজ্যটি,বনে পরিণত হইয়া সর্প অজগরাদি হিংস্রক জন্তুর কেন্দ্রস্থল হইয়া আছে, সে সেই আত্মা লইয়া শ্মশানকে স্বর্গ করিতে পারিবে কি? যে কোন লোক লোভ দেখাইয়া লোক হাত করিতে দাঁড়ায়, সে লোক নিশ্চয়ই স্বার্থপর।—এই স্বদেশী হুজুগেও লোভ দেখান হয় নাই কি?—ইহা কি স্বদেশ হিতৈষণা অথবা গোলামবুদ্ধির খেলা, কেহ তাহা বুঝিতে পারেন কি?

কল্পনা।—আমাদের জীবনযবনীকার অঙ্কে অঙ্কে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে; যাহাতে সেই সকল ঘটনা আমাদের জন্য সরল, সহজসাধ্য ও সুফলপ্রদ হয়, তজ্জন্য আমরা আগে হইতে সেই সকল ঘটনা সম্বন্ধে; যে সকল চিন্তা দ্বারা মনে মনে নিশ্চয় করি, তাহাই আমাদের কল্পনা। এই কল্পনা উত্তম হইলে ঘটনাফলও উত্তম হয়, মন্দ হইলে মন্দ হয়। সেইজন্য কল্পনা যত ভাল হইবে, আমাদের শিক্ষাও তত ভাল হইবে। আমাদের চালচলন, কথোপকথন, আচার-ব্যবহার আদি লইয়া, যে সকল কল্পনায় সাজাইয়া গ্রন্থ রচনা করি, তাহাকে 'নভেল' কহে। ধর্ম্মসম্বন্ধে কল্পনা করিয়া যাহা লিখি, তাহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ কহে। অঙ্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য যে সকল কল্পনা করিয়া গ্রন্থ লিখি, তাহাকে অঙ্কশাস্ত্র কহে, ইত্যাদি।

অনেকেই মনে করেন সত্য-কল্পনা একমাত্র অঙ্কশাস্ত্রেই আছে, কিন্তু তাহা নহে—যদি কল্পনা করিবার জ্ঞান থাকে তবে অন্যান্যগ্রন্থেও তাহা করা অসম্ভব নহে। অঙ্কশাস্ত্রে যে সকল অঙ্ক আমরা কষিয়া থাকি, অবিকল সেই অঙ্কগুলি না

আমরা অঙ্কশাস্ত্রের বিনা সাহায্যে সেই অঙ্ক কষিতে সক্ষম হই না। এই দৃষ্টান্তে যদি আমরা সুকল্পী কবির নভেল পাঠ করি, তবে সেই কল্পনার সাহায্যে আমরা আমাদের চালচলন ও আচার-ব্যবহারাদি জীবন অভিনয়ের অঙ্ক সুকল সংশোধিত করিয়া লইতে পারি। যদি কোন গ্রন্থকার তদীয় অঙ্কশাস্ত্রে ৫ + ৫ = ১০ বলেন, আর আমরা সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হই তবে আমরা অর্থাদির আদানপ্রদানকালে ভ্রম করিতে থাকিব; তেমনি নভেল-মধ্যে দুষ্য-কল্পনা স্থান পাইলে আমরা আমাদের চালচলনে বিকৃতবুদ্ধি প্রকাশ করিতে থাকিব। বঙ্কিমগ্রন্থে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের সেই অবস্থাই ঘটিয়াছে। কেবল কল্পনার বলেই মানবজাতি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, সেই মূলসম্বল যখন আমাদের মাথায় নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া প্রাধান্যলাভ করিতে পারিব। আমরা প্রকৃত জন্তু,যাহা করিতেছি তাহা অসভ্যসুলভ, হুজুগ মাত্র। অসভ্য কল্পনার বলে খ্রীষ্টিয়ানেরা, যিশুকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া অভিহিত করেন, এবং সেই ধারণা তাঁহাদের মাথায় এ কাল পর্য্যন্ত বজায় আছে। হঃ যিশু যে ঈশ্বর-পুত্র নহেন, একালের পতিতবুদ্ধি মোস্লেম-মৌলিভিরা তাহা, যে ভাবে প্রমাণ করেন, তাহা বিশ্বাষযোগ্য না হইলেও, পতিত লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিয়া লয়। আমরা রাজবুদ্ধিমতে তাহা অন্যরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছি দেখুন ;—

প্রমাণ।—যিশুখৃষ্ট যদি ঈশ্বরের পুত্র হন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাতে ঐশীশক্তি থাকিবে; কিন্তু আমরা তাঁহাতে সে শক্তি কোনস্থলেই দেখি নাই। তাঁহাতে যে সকল শক্তি ছিল, সেরূপ শক্তি অন্যান্য পয়গম্বর ও তাপসদিগের মধ্যেও দেখিয়াছি।—ঈশ্বর আমাদিগকে চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্রাদি; ফলকর বৃক্ষসহ নানাপ্রকার অন্নপণ্যের ব্যবস্থা ও ষড়ঋতু এবং সমুদ্র, কানন বন, পর্ব্বত, নির্ঝরাদি দিয়াছেন। যিশু সশরীরে ধরায় নামিয়া তদ্রূপ কোন দ্রব্য আমাদিগকে দান করিয়াছেন কি? আমরা প্রতিনিয়ত সমস্ত শর্ব্বরী চন্দ্রালোক পাই না, বর্ষার নিয়ম নাই। যিশুখৃষ্ট যদি এই সকল অসুবিধার সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয় তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বলিতাম। যখন তিনি ঈশ্বর-সৃষ্ট-পদার্থের তুল্য, কোন পদার্থই দিতে পারেন নাই, তখন কেমন করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বলিব। যদি রাজকুমার হইয়া রাজশক্তি দেখাইতে না পারেন, রাজ্যের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন আদিতে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ হন, তবে কখনই তিনি রাজকুমার নহেন।

সম্পূর্ণ।